চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

দিপু রায়, মো. গোলাম মোস্তফা ও মো. রবিউল ইসলাম

১৮ ডিসেম্বর ২০১৮[১]

[১] বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মচারী কল্যাণ সমিতির (বাচাশ্রই) মতামতের প্রেক্ষিতে পরিমার্জিত, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
মো. গোলাম মোস্তফা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
মো. রবিউল ইসলাম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

বিশেষ সহযোগিতায়
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মহুয়া রউফ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মনজুর -ই- খোদা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, শাহনূর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মো. মোস্তফা কামাল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মোঃ শহিদুল ইসলাম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, অমিত সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার

কৃতজ্ঞতা
চা বাগানের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং বাংলাদেশীয় চা সংসদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য এবং চা শ্রমিকগণ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ, ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওয়াহিদ আলমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক আবদুল আহাদ, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা ও মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫ ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া টিআইবি'র চলমান বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেঞ্জ (বিবেক) প্রকল্পে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের চা শ্রমিকদের সুস্থ কাজের পরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও এর থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

চা শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার ওপর এই গবেষণায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে চা বাগানের জীবন মান উন্নয়নে সরকার, চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও বিভন্ন এনজিও বিভিন্নরকম উদ্যোগের ফলে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম। এখনও তাদের যে দৈনিক মজুরি (প্রাপ্ত সকল সুবিধার আর্থিক মূল্যমান হিসাবে) দেওয়া হচ্ছে তা একই মাপকাঠিতে প্রাক্কলিত দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম। আইনগতভাবে তাদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে রাখা এবং তাদের জন্য নির্ধারিত আইনগত অধিকার অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিতে ঘাটতির তথ্যও এই গবেষণায় উঠে এসেছে। তাছাড়া তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারি যে সকল তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির কারণে বৈষম্য ও বঞ্চনা অব্যাহত রয়েছে। চা শ্রমিকদের অধিকার ও কর্মপরিবেশ সংশ্লিষ্ট গবেষণায় চিহ্নিত এসব আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, বিরাজমান চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে চা শিল্পের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে চা বাগান কর্তৃপক্ষ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যদাতা, তদারকি কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মী, এবং অন্যান্য অংশীজনের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক দিপু রায়, মো. গোলাম মোস্তফা ও মো. রবিউল ইসলাম। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই গবেষণায় বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব এর নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সরকারি ও বেসরকারি চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক এবং অংশীজন কর্তৃক চা শ্রমিকদের সুস্থ কর্মপরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা.......... ৯

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা.......... ৯

১.২ বাংলাদেশের চা বাগানের ইতিহাস.......... ৯

১.৩. বাংলাদেশের চা বাগানের পরিচিতি.......... ৯

১.৪. গবেষণার উদ্দেশ্য.......... ১৩

১.৫. গবেষণার পরিধি.......... ১৩

১.৬. গবেষণা পদ্ধতি.......... ১৪

১.৭. জরিপের প্রশ্নমালা প্রণয়ন.......... ১৬

১.৮. তথ্য সংগ্রহকারী.......... ১৬

১.৯. তথ্যের সত্যতা যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ.......... ১৬

১.১০. গবেষণা কাল.......... ১৬

১.১১. প্রতিবেদন কাঠামো.......... ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক পরিচিতি.......... ১৭

৩.১. উত্তরদাতার পরিচিতি.......... ১৭

৩.২. খানা সদস্যদের লিঙ্গ পরিচয় ও পরিবারের আকার.......... ১৭

৩.৩. খানা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা.......... ১৭

৩.৪. খানা সদস্যদের বয়স.......... ১৮

৩.৫. খানা সদস্যদের পেশা.......... ১৮

৩.৬. খানার ৬-১২ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ও পেশা.......... ১৮

৩.৭. চা শ্রমিকদের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার.......... ১৯

৩.৮. চা শ্রমিক পরিবারের মাসিক আয় ও ব্যয়.......... ১৯

৩.৯. বাগান হতে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে চা শ্রমিকদের সচেতনতা.......... ১৯

৩.১০. উত্তরদাতার কাজের ধরন, তাদের চুক্তির ধরন ও পঞ্চায়েতের সাথে সংশ্লিষ্টতা.......... ২০

তৃতীয় অধ্যায়: আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ.......... ২১

২.১.১ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩).......... ২১

২.১.২ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫.......... ২২

চতুর্থ অধ্যায়: কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করণ ও অধিকার প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জসমূহ.......... ২৪

৪.১. চাকরি স্থায়ীকরণ.. ২৪
৪.২. স্থায়ী হিসেবে নিয়োগের প্রমাণ হিসেবে নথি সরবরাহ ও সার্ভিস বই সংরক্ষণ...২৬
৪.৩. মজুরি ২৭
৪.৪. পাতার ওজনকরণ ও কর্মঘণ্টা...৩০
৪.৫. কাজের পরিবেশ ৩২
৪.৬. ছুটি ৩৪
৪.৭. উৎসব ভাতা বা বোনাস... ৩৫
৪.৮. রেশন ৩৬
৪.৯. আবাসন... ৩৮
৪.১০. শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ৪৪
৪.১১. চিকিৎসা সেবা...৪৬
৪.১২. সঞ্চয় ৫০
৪.১৩. ভবিষ্য তহবিল ৫০
৪.১৪. অবসর গ্রহণ, অবসরপ্রাপ্তদের ভবিষ্য তহবিল ও অবসর ভাতা... ৫৩
৪.১৫. বিনোদন ব্যবস্থা.. ৫৬
৪.১৬ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ৫৬
৪.১৭ শিশুসদন...৫৭
৪.১৮ বাগানে পৌঁছানো ও ভিতরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ৫৭
৪.১৯ অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি..৫৭
৪.২০ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত-সুযোগ সুবিধা.. ৫৮
৪.২১ মৃত শ্রমিকের সৎকার্যে কর্তৃপক্ষের সহায়তা.. ৫৯
৪.২২ শ্রমিক নির্যাতন.. ৫৯
৪.২৩ শ্রমিকদের সাথে অবমাননাকর আচরণ ৬০
৪.২৪ শ্রমিকদের মাদকাসক্তি ৬০
৪.২৫ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বে অবহেলা ও দুর্নীতি...৬০
অধ্যায় পাঁচ: প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা...৬১
৫.১. প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ ৬১
৫.২ বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন..৬২
৫.৪. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ৬২

৫.৫. নারী সর্দার নিয়োগ ৬৩

৫.৬. তথ্য না জানা........ ৬৩

৫.৭. চা বাগান এলাকায় নলকূপ বসানোয় সমস্যা........ ৬৩

৫.৮. সরকারি বরাদ্দ ব্যয়ে চ্যালেঞ্জ........ ৬৩

৫.৯ শ্রমিকদের বাড়ির গাছ ব্যবহারের অধিকার........ ৬৩

অধ্যায় ছয়: উপসংহার ও সুপারিশ........ ৬৫

৬.১. উপসংহার........ ৬৫

৬.২ সুপারিশ ৬৬

পরিশিষ্ট........ ৭১

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: বাংলাদেশের চা বাগানের সংখ্যা, লীজকৃত জমির পরিমাণ, শ্রেণি ও কর্তৃপক্ষ ১০
সারণি ১.২: এক নজরে গবেষণার পরিধি ১৪
সারণি ১.৩: একনজরে তথ্য সংগ্রহের কৌশল, তথ্যের উৎস এবং তথ্য সংগ্রহের টুলস ১৫
সারণি ৩.১: খানা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৭
সারণি ৪.১: স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে সময়ক্ষেপণ ২৫
সারণি ৪.২: বাগানের সংখ্যা ২৭
সারণি ৪.৩: অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী না করার কারণ ২৭
সারণি ৪.৪: চা শ্রমিকদের মজুরি ২৮
সারণি ৪.৫: বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের মজুরির তুলনামূলক চিত্র ২৯
সারণি ৪.৬: অস্থায়ী শ্রমিকদের কম মজুরি প্রদানকারী বাগানের সংখ্যা ও মজুরির পরিমাণ ২৯
সারণি ৪.৭: পাতার ওজন কম দেখানো বা কেটে রাখার কারণ বা খাতসমূহ ৩১
সারণি ৪.৮: দৈনিক কর্তনকৃত পাতার হিসাব ৩১
সারণি ৪.৯: কীটনাশক ছিটানোর সময় দ্রব্যাদি দেওয়া না দেওয়ার হার ৩৩
সারণি ৪.১০: রেশন কেটে রাখার কারণ ৩৭
সারণি ৪.১১: রেশন ওজনে কম হওয়ার পরিমাণ ৩৭
সারণি ৪.১২: ঘর দেওয়ার অংশীজনের ধরন ৩৯
সারণি ৪.১৩: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত ঘরের ধরন ৩৯
সারণি ৪.১৪: নলকূপ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ধরন ৪২
সারণি ৪.১৫: শৌচাগার ব্যবস্থাকারী কর্তৃপক্ষ ৪৩
সারণি ৪.১৬: বাগানগুলোতে চলমান বিদ্যালয়ের ধরন ৪৪
সারণি ৪.১৭: ৬-১২ বছরের শিশুর স্কুলে না যাওয়ার কারণ (শতকরা) ৪৫
সারণি ৪.১৮: বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে স্টাফদের সংখ্যা ৪৬
সারণি ৪.১৯: বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী ৪৭
সারণি ৪.২০: বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা নেওয়ার কারণ (শতকরা) ৪৯
সারণি ৪.২১: ভবিষ্য তহবিলে টাকা জমা না হওয়ার কারণ (শতকরা) ৫১
সারণি ৪.২২: অবসর ভাতা না পাওয়ার কারণ (শতকরা) ৫৫
সারণি ৪.২৩: বিভিন্ন বিনোদন ব্যবস্থা ৫৬
সারণি ৪.২৪: বাগানের ভিতরকার রাস্তার অবস্থা ৫৭
সারণি ৬.১: চা বাগান শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জের কারণ, ফলাফল ও প্রভাবের সার্বিক চিত্র ৬৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র ৩.১: খানার সদস্য সংখ্যার চিত্র ১৭
চিত্র ৩.২: খানার সদস্যদের পেশা (শতকরা) ১৮
চিত্র ৩.৩: ছয় থেকে ১২ বছর বয়সী শিক্ষা থেকে বাদ পরা শিশুদের পেশা ১৮
চিত্র ৩.৪: চা শ্রমিকদের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার ১৯
চিত্র ৩.৫: চা শ্রমিক পরিবারগুলোর মাসিক আয় ১৯
চিত্র ৩.৬: বাগান হতে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে চা শ্রমিকদের সচেতনতা ১৯
চিত্র ৩.৭: উত্তরদাতার কাজের ধরন ২০
চিত্র ৪.১: শ্রমিকদের স্থায়ী হবার ধরন ২৪
চিত্র ৪.২: স্থায়ী হবার সময় প্রদেয় দলিল ২৬
চিত্র ৪.৩: পাতার ওজনের সঠিকতা ৩১
চিত্র ৪.৪: কীটনাশক ছিটানোর সময় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবহার ৩৪
চিত্র ৪.৫: উৎসব ভাতা কম পাওয়ার কারণ ৩৫
চিত্র ৪.৬: রেশন কম হওয়ার হার ৩৭
চিত্র ৪.৭: প্রাপ্ত রেশনের মান ৩৮
চিত্র ৪.৮: প্রাপ্ত রেশনে প্রয়োজন মেটার অবস্থা ৩৮
চিত্র ৪.৯: একটি ঘর বিশিষ্ট আবাসনে বসবাসকারী পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪০
চিত্র ৪.১০: আবাসন মেরামতের অংশীজনের ধরন ৪০
চিত্র ৪.১১: শ্রমিকদের আবাসনে আলোর ব্যবস্থা ৪১
চিত্র ৪.১২: শ্রমিকদের আবাসনে খাবার পানির উৎস ৪২
চিত্র ৪.১৩: শ্রমিকদের আবাসনে শৌচাগারের ধরন ৪৩
চিত্র ৪.১৪: অধ্যয়নরত বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী শ্রমিক সন্তানদের হার ৪৫
চিত্র ৪.১৫: বাগানের চিকিৎসা সেবায় শ্রমিকের সন্তুষ্টির মাত্রা ৪৮
চিত্র ৪.১৬: বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকের বাইরে চিকিৎসা সেবা গ্রহনের ব্যয় বহনের হার ৪৮
চিত্র ৪.১৭: শ্রমিক পরিবারের সঞ্চয় থাকার হার ৫০
চিত্র ৪.১৮: ভবিষ্য তহবিলে নাম থাকা না থাকার হার ৫০
চিত্র ৪.১৯: ভবিষ্য তহবিলে টাকা নিয়মিত জমা হওয়ার হার ৫১
চিত্র ৪.২০: ভবিষ্য তহবিলে টাকা জমার নথি সরবরাহের হার ৫২
চিত্র ৪.২১: ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রাপ্তিতে সমস্যার ধরন ৫৩
চিত্র ৪.২২: ভবিষ্য তহবিলের টাকা না পাওয়ার কারণ ৫৪
চিত্র ৪.২৩: অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৫৮
চিত্র ৪.২৪: সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির হার ৫৯

বক্সের তালিকা

বক্স ৪.১: একজন নারী শ্রমিকের কথা ৩৩
বক্স ৪.২: ফাড়ি বাগানে একজন পুরুষ শ্রমিকের ভাষ্য ৪০
বক্স ৪.৩: ফাড়ি বাগানের একজন পুরুষ শ্রমিকের ভাষ্য ৪৯
বক্স ৪.৪: ফাড়ি বাগানের একজন শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের নথি পাওয়া বিষয়ে বক্তব্য ৫২
বক্স ৪.৫: একজন শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ কম পাবার ঘটনা ৫৪
বক্স ৪.৬: এক মৃত শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ না পাওয়ার তথ্য ৫৫
বক্স ৪.৭: চা বাগানের কারখানার দুইজন শ্রমিকের কথা ৫৬
বক্স ৪.৮: শিশু সদন সম্পর্কে শ্রমিকদের ভাষ্য ৫৭
বক্স ৪.৯: পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগ ৫৮
বক্স ৫.১: তথ্য না জানা বিষয়ক একজন শ্রমিকের ভাষ্য ৬৩
বক্স ৫.২: গাছ কাটা বিষয়ে একজন শ্রমিকের ভাষ্য ৬৩
বক্স ৫.৩: শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বিষয়ে একজন মুখ্য তথ্যদাতার ভাষ্য ৬৪

শব্দ-সংক্ষেপ

টিআইবি- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিটিএ-বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন
বিটিআরআই-বাংলাদেশ টি রিসার্চ ইনস্টিটিউট
ডিডিএল-ডেপুটি ডিরেক্টও, লেবার
বিটিবি- বাংলাদেশ টি বোর্ড
বিবেক-বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেঞ্জ
ডিআইজি- ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল
এনজিও-নন গভরমেন্ট অর্গানাইজেশন
পিডিইউ-প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট
পিএফ-প্রভিডেন্ট ফান্ড
সেড- সোসাইটি ফর এনভারনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
একনেক-জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি
এসপিএসএস- স্ট্যাটিসটিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশ্যাল সাইন্স
পিইসি-প্রাইমারী এডুকেশন কমপ্লিশন
ইউপি-ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডি-ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট
ভিজিএফ- ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে মোট চা উৎপাদন হয়েছে ৭৮.৯৫ মিলিয়ন কেজি।[২] এ বছর চা থেকে রপ্তানি আয় ছিল মোট ৫৯.১৮[৩] কোটি টাকা এবং জিডিপিতে চা শিল্পের মোট অবদান ১৮২৫.২৫ কোটি[৪] টাকা। চা বাগান বা চা শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৫ লক্ষ[৫] লোকের জীবিকা নির্ভর করে। বর্তমানে বাংলাদেশে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিবন্ধনকৃত মোট চা বাগানের সংখ্যা হচ্ছে ১৬৪টি - যার মধ্যে মূলধারার চা বাগান রয়েছে ১৫৬টি। এ সকল চা বাগানে প্রায় এক ১,২২,৮৪০ শ্রমিক রয়েছে- যার মধ্যে ২১,৯৯৭ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করছে।

১.২ বাংলাদেশের চা বাগানের ইতিহাস[৬]

ভারতবর্ষে চা বাগান কবে থেকে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। তবে বাংলাদেশ চা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ১৮০০ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের আসাম ও এর আশেপাশের এলাকায় প্রথমে চা চাষ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কর্নফুলি নদীর পারে ১৮২৮ সালে প্রথমে একটি চা চাষের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই সময়ে চা চাষ বিলম্বিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৪০ চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় যা কুন্ডদের চা বাগান নামে পরিচিত। এটিও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে সিলেট শহরের এয়ারপোর্ট রোডের কাছে ১৮৫৪ সালে মতান্তরে ১৮৪৭ সালে মালনীছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এই মালনীছড়া চা বাগানই বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান।[৭] দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র দুটি জেলায় চা আবাদ হত। এর একটি সিলেট জেলায় যা 'সুরমা ভ্যালি নামে পরিচিত এবং অন্যটি চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত যা হালদা ভ্যালি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে সুরমা ভ্যালিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যা যথাক্রমে - লস্করপুর, বালিশিরা, মনু-দলই, লংলা এবং নর্থ সিলেট ভ্যালি এবং হালদা ভ্যালিকে চট্টগ্রাম ভ্যালি করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে চা বাগানসমূহ প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এসময়ে সরকার এই শিল্পকে দাঁড় করানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভর্তুকি মূলে চা বাগানোর জন্য সার সরবরাহ করা হয়। চা কারখানাগুলির পুনর্বাসনের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া থেকে ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা মূল্যের ঋণ নিয়ে চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। বাগান কর্তৃপক্ষের ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং শ্রমিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

১.৩. বাংলাদেশের চা বাগানের পরিচিতি ভোটাধিকার

বাংলাদেশে মূলধারার বা প্রথাগত[৮] মোট ১৫৩টি চা বাগান রয়েছে এবং এই ১৫৩টি বাগানের আবার ৭৬টি ফাড়ি বাগান রয়েছে।[৯] এসব বাগানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চা বাগান অবস্থিত মৌলভীবাজার জেলায় এবং এখানে মোট ১৩৫টি চা বাগান অবস্থিত। মূলধারার চা বাগানগুলো মোট ১১৮,২১৩.০৮ একর জমিতে অবস্থিত।[১০]

---

[২] বাংলাদেশ চা বোর্ড, তথ্যের উৎস - http://www.teaboard.gov.bd/site/page/a099a245-4ea1-4de8-abf0-9f49eec3af78/উৎপাদন-ও-রপ্তানী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ - ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭

[৩] বাংলাদেশীয় চা সংসদের ব্রশিউরে উল্লিখিত ২০১৭ সালে প্রতি কেজি চায়ের মূল্য (২৩১.১৯ টাকা) হিসেবে প্রাক্কলিত, পৃষ্ঠা নম্বর ০৪

[৪] বাংলাদেশীয় চা সংসদের ব্রশিউরে উল্লিখিত ২০১৭ সালে প্রতি কেজি চায়ের মূল্য (২৩১.১৯ টাকা) হিসেবে প্রাক্কলিত, পৃষ্ঠা নম্বর ০৪

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নম্বর ০৪

[৬] বাংলাদেশের চা বাগানের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যগুলো বাংলাদেশ চা বোর্ডের ওয়েবসাইটে উল্লিখিত 'চা শিল্পের ইতিহাস' থেকে নেওয়া হয়েছে। তথ্যের উৎস - http://teaboard.portal.gov.bd/sites/default/files/files/teaboard.portal.gov.bd/page/c1041fba_7071_4dcd_8d64_82b3242ababc/History%20Of%20Tea%20Industry%20BAN.pdf, তথ্য সংগ্রহের তারিখ - ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭

[৭] বাংলাদেশ চা বোর্ড, তথ্যের উৎস - http://teaboard.portal.gov.bd/sites/default/files/files/teaboard.portal.gov.bd/page/c1041fba_7071_4dcd_8d64_82b3242ababc/History%20Of%20Tea%20Industry%20BAN.pdf তথ্য সংগ্রহের তারিখ - ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭

[৮] এই গবেষণায় মূলধারা বা প্রতাগত চা বাগান বলতে ওই বাগানগুলোকে বোঝানো হয়েছে যেগুলোর ব্রিটিশ আমল থেকে তৈরি করা হয়েছে যেখানে শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে বাগান মালিকের দেওয়া বাসস্থানে বসবাস করছে, তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাগান মালিক কর্তৃক দেওয়ার নিয়ম

সারণি ১.১: বাংলাদেশের চা বাগানের সংখ্যা, লীজকৃত জমির পরিমাণ, শ্রেণি ও কর্তৃপক্ষ

জেলার নাম	মূল বাগান (সংখ্যা)	ফাড়ি বাগান (সংখ্যা)	মোট (সংখ্যা)	জমির পরিমাণ (একর)
মৌলভীবাজার	৯২	৪৩	১৩৫	১,৫৪,৪৪৭.৩৭
হবিগঞ্জ	২৬	১৮	৪৪	৫৩,৯৫৫.৩২
সিলেট	১৫	১১	২৬	২৮,৯৩৬.৩২
চট্টগ্রাম	১৯	৪	২৩	৩৪,৫৬০.৪৫
রাঙ্গামাটি	১	০	১	৭৬০.৯৯
মোট	**১৫৩**	**৭৬**	**২২৯**	**১১৮,২১৩.০৮**

বাংলাদেশ টি বোর্ডের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে মূলধারার মোট ১৫৬টি চা বাগান রয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে যেখানে ফাড়ি বাগানগুলোকে আলাদা করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। চা বাগানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ টি বোর্ডের সংজ্ঞা অনুসারে মূল বাগানের মধ্যে ১২৯টি টি এস্টেট রয়েছে এবং ২৭টি চা বাগান রয়েছে। এখানে টি এস্টেট বলতে 'চা গাছ হতে আহরণকৃত পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং শ্রমিক/কর্মচারীর মৌলিক সুযোগ সুবিধাসহ বাগানকে বুঝানো হয়েছে'। আর চা বাগান বলতে '২৫.০০(পঁচিশ) একর বা ১০.১২ হেক্টরের অধিক ভূখন্ড সম্বলিত চা বাগানকে বোঝানো হয়েছে যা টি এস্টেট নয়।'[১১] আবার বাংলাদেশীয় চা সংসদের অন্তর্ভুক্ত ১৪৭টি বাগান রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৪৭টি 'এ'[১২] ক্যাটাগরি, ৫০টি 'বি'[১৩] ক্যাটাগরি এবং ৫০টি 'সি'[১৪] ক্যাটাগরির বাগান রয়েছে। বাকি চা বাগানের শ্রেণি সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সকল চা বাগানের মধ্যে মাত্র তিনটি বাগান রয়েছে সরকারি মালিকানাধীন। অন্য সকল বাগান বেসরকারি বা যৌথ মালিকানাধীন। এসব বাগানের মধ্যে দেশি ও বিদেশি মালিকানাও রয়েছে।

চা শিল্পের উন্নয়ন তথা চায়ের উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা ও পরিত্যক্ত চা বাগান পুনর্বাসন, বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের উপর উপ-কর আরোপ এবং তার সহায়ক অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সামগ্রিকভাবে চা শিল্পের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি) নামক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা রয়েছে। ১. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) এবং বাংলাদেশ টি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) যেগুলো মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত।

অন্যদিকে বাংলাদেশীয় চা সংসদ নামে বেসরকারি চা বাগান কর্তৃপক্ষের একটি সংগঠনও রয়েছে যা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে দর কষাকষি করে থাকে। এই সংগঠনটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যা বিভিন্ন চা বাগান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। তবে সবগুলো বেসরকারি বাগান এই সংগঠনের সদস্য নয়। এই সংগঠনটি চা কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে।

এছাড়া বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন হচ্ছে চা শ্রমিকদের একমাত্র ইউনিয়ন যারা চা বাগানের কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, দাবি-দাওয়া ইত্যাদি নিয়ে দর কষাকষি এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করে। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন। এখানে মোট ৯০ হাজার স্থায়ী শ্রমিকসহ মোট এক লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমিক সদস্য রয়েছে। সংগঠনটিকে চালিয়ে রাখার জন্য শ্রমিকরা প্রতি মাসে মাসিক চাঁদা প্রদান করে থাকে। এই সংগঠনের তিনটি স্তর রয়েছে - কেন্দ্রীয় কমিটি, সাতটি ভ্যালি কমিটি এবং ২২৮টি পঞ্চায়েত। তবে সরকারি একটি বাগানের কোনো পঞ্চায়েত নাই এবং সেখানকার কোনো শ্রমিক পঞ্চায়েতের সদস্য নয়। ২০০৮ সালের ২৬ অক্টোবর ও ২ নভেম্বর মাসে প্রথম বারের মতো এই সংগঠনটির প্রতিটি স্তরের জন্য মুক্ত ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তবে এই কেন্দ্রীয় কমিটি ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচিত কমিটিকে বিরোধী দল অবৈধ ঘোষণা করে জোর করে ক্ষমতা দখল করে। এরপরে গত ২০১৪ সালের ১০ আগস্ট নতুন করে

রয়েছে। এই বাগানগুলো জমির মালিক সরকার যা প্রাইভেট কোম্পানি বা কোনো ব্যক্তি লীজ নিয়ে কিংবা সরকার নিজেই মালিক হিসেবে চা বাগান তৈরি ও পরিচালনা করেছে।

[৯] বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নিকট থেকে প্রাপ্ত চা বাগানের তালিকা যেখানে নির্বাচিত পঞ্চায়েত রয়েছে এবং সরকারি একটি বাগান যেখানে পঞ্চায়েত নেই।

[১০] বাংলাদেশ চা বোর্ড, তথ্যের উৎস - http://teaboard.portal.gov.bd/sites/default/files/files/teaboard.portal.gov.bd/page/29bd5255_3a7d_4858_aa52_cccb654c502d/164%20Tea%20Garden%20List.pdf, তথ্য সংগ্রহের তারিখ - ৩১ জানুয়ারি ২০১৮

[১১] বাংলাদেশ চা বোর্ড, তথ্যের উৎস - http://teaboard.portal.gov.bd, ৩১ জানুয়ারি ২০১৮

[১২] প্রতি হেক্টর উৎপাদন ক্ষমতা ১৬০১ কেজি বা তার বেশি

[১৩] প্রতি হেক্টর উৎপাদন ক্ষমতা ১১০১ কেজি থেকে ১৬০০ কেজি

[১৪] প্রতি হেক্টর উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ কেজি থেকে ১১০০ কেজি

নির্বাচন হয় এবং পূর্বের নির্বাচিত কমিটিই নির্বাচিত হয়। সর্বশেষ ২৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে আবারও একটি নির্বাচন হয় এবং তাতেও পূর্বের কমিটিই বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়।

চা শ্রমিকদের জন্য সুস্থ কর্মপরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারিভাবে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার কথা উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান'। ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮ (১) ও ২৯ (২) অনুচ্ছেদেও সকল নাগরিকের সমতার কথা উল্লেখ রয়েছে। ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' ২৯ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না'। সংবিধানের এই ধারা দুটিকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, দেশের সকল নাগরিকের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে। এছাড়া জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ এর চতুর্থ উদ্দেশ্য হিসেবে 'শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের' অঙ্গীকার করা হয়েছে'।[১৫]

আওয়ামী লীগের ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে চা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮.১ অনুচ্ছেদে 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে[১৬]' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ২২.১ অনুচ্ছেদে 'অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে[১৭]' বলেও উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ চা শ্রমিকদের জন্য কাজের স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা, কাজের স্থানে শৌচাগার ও প্রক্ষালণ ব্যবস্থা, বিনোদন ব্যবস্থা, শ্রমিকগণের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা, শিশু সদন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, চা-বাগানের গৃহায়ণ ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, আবাসিক এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা, চা-বাগান শ্রমিকদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় এবং ২৭০ থেকে ৩০২ বিধিতে চা শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিলের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন উল্লেখ রয়েছে শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ চা বাগান শ্রমিক ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়ে নাগরিক সনদে। উক্ত সনদে চা শ্রমিক-কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের উৎস, বিধি মোতাবেক শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিলের টাকা উত্তোলন পদ্ধতি, প্রশাসনিক চার্জ, ভবিষ্য তহবিলের আইন ও বিধিমালা, আইনগতভাবে চা শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার সংরক্ষণের নিয়ম, শ্রমিক-কর্মচারীদের পিএফ চাঁদা অনাদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ধীরে ধীরে চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ২০০৯ সাল থেকে নিয়মিত চা বাগানের মালিক ও চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রতি দুই বছর পর পর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।[১৯] সর্বশেষ অক্টোবর ২০১৮ সালে 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষর করা হয়। এই স্মারক অনুযায়ী চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে - চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৮৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০২ টাকা করা, অস্থায়ী শ্রমিকদেরও স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় মজুরি প্রদান করা, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা, বছরে দুটি উৎসব ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা, পূর্ণ মজুরিসহ ২০ দিনের

[১৫] জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৮ মে ২০১২

[১৬] 'দিন বদলের সনদ', নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০০৮

[১৭] এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

[১৮] বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৫, http://mole.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mole.portal.gov.bd/legislative_information/4367f83b_3431_4551_841d_5c9be61454f9/Labour%20Rules%202015.pdf,

[১৯] উল্লেখ্য চা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পর থেকেই সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হলেও ২০০৪ সালের পর থেকে তা কিছুটা অনিয়মিত ছিল। ২০০৯ সাল থেকে তা আবার নিয়মিত করা হয়

অসুস্থতাজনিত ছুটি প্রদান, গ্র্যাচুইটিসহ গ্রুপ বিমার ব্যবস্থা করা।[২০] বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক "চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা" নামক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যার প্রাক্কলিত বাজেট ধরা হয় ৯৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এই নকশায় যেসব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - ১৫ হাজার ইউনিট শ্রমিক বাসস্থান নির্মাণ, ১৫ হাজার শৌচাগার স্থাপন ও ৪০টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৪ হাজার ৫ শত হস্তচালিত নলকূপ এবং পাত কুয়া স্থাপন, ১০০টি মাদার'স ক্লাব প্রতিষ্ঠাকরণ, চা বাগান এলাকায় রাস্তা-ঘাটসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের আইনগত অধিকার সংরক্ষেণের ব্যবস্থা করা। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃকও "চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" এর আওতায় চা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ চা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে 'কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬' অনুমোদন করা হয়েছে। সর্বশেষ ৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের র্নিাহী কমিটির (একনেক) সভায় 'চা বাগানকর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৬১ কোটি ১৪ লাখ টাকা।

চা শ্রমিকদের উন্নয়নে উপরোল্লিখিত ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে এখনও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার তথ্য পাওয়া যায়। সোসাইটি ফর এনভারনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এর একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'চা শ্রমিকরা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত ও শোষিত গোষ্ঠী। এরা বঞ্চিতদের মধ্যেও বঞ্চিত এবং চা বাগানের 'বাধা' শ্রমিক।[২১] সেডের আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, 'স্কুলগুলোতে বসবার পর্যাপ্ত বেঞ্চ নেই, চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ বা শিক্ষক নেই, নলকূপ, আসবাবপত্র, এমনকি শ্রেণির জন্য একটি হাজিরা খাতাও নেই। নিম্নমানের ও অপর্যাপ্ত বাসস্থান, অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা চা শ্রমিকদের আবাসস্থল লেবার লাইনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য[২২]। বঞ্চিত, শোষিত ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন অধিকাংশ চা শ্রমিক বাধ্য হচ্ছেন অমানবিক জীবন যাপন করতে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবীয় মর্যাদা রক্ষাসংক্রান্ত অসংখ্য সাংবিধানিক ও আইনগত ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন দেখা যায় চা-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে (গাইন ফিলিপ - ২০০৯)[২৩]। ব্রিটিশরা চা শ্রমিকদের মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা সর্বনিম্ন রেখেছিল। ফলে অনেক শ্রমিক ছোট্ট একটি জায়গায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা ব্যতীত অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও পশুদের মতো দিনাতিপাত করত (সুদীপ্ত আরিকুজ্জামান - ২০১৬)[২৪]। বাংলাদেশের চা বাগানের শ্রমিকরা হচ্ছে বাংলাদেশে সবচেয়ে অবহেলিত সম্প্রদায় যাদের অধিকার আইনগতভাবেই লঙ্ঘন করা হয় (উল্লাহ মো. রহমত - ২০১৪)[২৫]।

আবার গণমাধ্যমের খবর বিশ্লেষণ করলেও চা শ্রমিকদের জীবন-যাপনের করুণ চিত্র উঠে আসে। নিম্নে গণমাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো - তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক, মশা, সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে মাত্র ৮০-৯০ টাকার বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করে, কোনো কথা বলে না। চা বাগানের শ্রমিকরা চা বাগানের অভ্যন্তরে ও বাইরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করলেও তারা জানে না শ্রমিক অধিকারের কথা।[২৬] একজন নারী চা শ্রমিক বাঁ পুরুষ শ্রমিক সে যেই হোক না কেন প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানবিক ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ২৩ কেজি পাতি উত্তোলনের বিপরীতে মাত্র ৮৫ টাকা পেয়ে থাকেন[২৭], সামান্য মজুরির চা শ্রমিকদের দুর্দশায় ভরা জীবন,[২৮] নিজভূমে পরবাসী চা শ্রমিকরা, কাটাচ্ছেন মানবেতর জীবনযাপন। চা গাছ ছেঁটে ছেঁটে ২৬ ইঞ্চির বেশি বাড়তে দেয়া হয় না। চা শ্রমিকের জীবনটাও ছেঁটে দেয়া চা গাছের মতোই, লেবার লাইনের ২২২ বর্গফুটের একটা কুঁড়েঘরে বন্দি। মধ্যযুগের ভূমিদাসের মতোই চা মালিকের বাগানের সঙ্গে বাধা তার নিয়তি[২৯] ভূসম্পত্তি না থাকায় চাকরি বঞ্চিত হচ্ছে চা শ্রমিক পরিবারের দুই যুবক,[৩০] বাজার অর্থনীতিকে অন্যসব খাতে স্বাধীনভাবে

[২০] Memorandum of labour Agreement, 01.01.2015 to 31.12.2016

[২১] বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সোসাইটি ফর এনভারনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, মার্চ ২০১৪, তথ্যের উৎস - http://sehd.org/images/euproject/brochurebangla.pdf, তথ্য সংগ্রহ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

[২২] প্রাগুক্ত, http://sehd.org/images/euproject/brochurebangla.pdf, তথ্য সংগ্রহ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

[২৩] গাইন ফিলিপ, চা শ্রমিকের কথা, বাংলাদেশের চা ও চা-শ্রমিক, ২০০৯, পৃষ্ঠা নম্বর ১৪

[২৪] সুদীপ্ত আরিকুজ্জামান, On Human Bondage, Slave in this times: Tea Communities of Bangladesh, পৃষ্ঠা নম্বর ৩০১, ২০১৬

[২৫] উল্লাহ মো. রহমত, Story of the Tea Workers Subsistence against Hegemony, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা নম্বর ১৯৯

[২৬] মৌলভীবাজার টুয়েন্টিফোর ডেস্ক, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৭

[২৭] খাঁ মাহমুদা, বাংলা ইনসাইডার, নারী চা শ্রমিকদের জীবন চিত্র, ১৫ জুলাই ২০১৭, তথ্যের উৎস - htths://www.banglarinsider.com, তথ্য সংগ্রহের তারিখ - ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

[২৮] সঠিক সংবাদ, সামান্য মজুরির চা শ্রমিকদের দুর্দশায় ভরা জীবন, ১৫ জানুয়ারি ২০১৬

[২৯] আহমেদ সেলিম, মানব কণ্ঠ, ছেটে দেওয়া গাছের মতো চা শ্রমিকদের জীবন, ২০.০৫.২০১৭, তথ্য সংগ্রহ: ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

[৩০] সঠিক সংবাদ, ০৮.০২.২০১৬, ভূসম্পত্তি না থাকায় চাকরি বঞ্চিত হচ্ছে চা শ্রমিক পরিবারের দুই যুবক, তথ্য সংগ্রহ: ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

চলতে দিলেও, চা-বাগানে কেবল তাকে বাধাই দেওয়া হয়নি, রীতিমতো নিষিদ্ধ করে রেখেছে, শ্রমবাজারের এই আদলটি একটি দাসত্বের পরিকাঠামো যা মুক্তবাজার অর্থনীতির মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক[৩১]। চা শ্রমিকদের খুবই কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তারা ভারতের চা শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম পারিশ্রমিক পায়। তারা দৈনিক ৮৫ টাকা পারিশ্রমিক পায় যা তাদের জীবন-যাপনের জন্য যথেষ্ট নয়, বিশেষকরে যে এলাকা চা বাগান বেষ্টিত সেখানে অন্য কাজ করার সুযোগ নাই।[৩২] চা-শ্রমিকদের অবস্থা বড়ই করুণ। তারা বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে সপ্তাহে ছয় দিন ৮টা-৫টা কাজ করে থাকেন। এতে যা পান, তাতে কোনো মতে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে। তাদের আয়-ব্যয় থাকলেও কোনো সঞ্চয় নেই, নেই তাদের বিনিয়োগ। তাদের অর্থনৈতিক অতীত যেমন ছিল অন্ধকার, তেমনি তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তারা পেটে-ভাতে বেঁচে আছেন যুগ যুগ ধরে এবং এভাবেই হয়তো বেঁচে থাকতে হবে বাকি জীবন ধরে[৩৩]।

গবেষণা ও গণমাধ্যম ছাড়াও স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে চা-শ্রমিকদের অবস্থা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমাবদ্ধতা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উঠে আসে।[৩৪] এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে চা শ্রমিকরা তাদের মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন, মানববন্ধন ও বিক্ষোভে জড়িত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।[৩৫] তবে চা বাগানের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপরে সরাসরি সুশাসনের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি লক্ষণীয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির ব্রত নিয়ে দু'দশক ধরে কাজ করে আসছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া টিআইবি'র চলমান বিবেক প্রকল্পে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রীমঙ্গল সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)'র পরামর্শের প্রেক্ষিতে চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করে।

১.৪. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও এর থেকে উত্তরণের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১. চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;

২. চা শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

৩. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যমান পরিস্থিতি উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা

১.৫. গবেষণার পরিধি

প্রথাগত পদ্ধতি অর্থাৎ মূলধারার শ্রমিক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা রয়েছে এমন চা বাগান প্রধানত যে সকল জেলায় অবস্থিত যেমন সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটির চা বাগানগুলোকে জরিপের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় বাংলাদেশের

---

[৩১] চায়ের কাপের আড়ালের গল্প, htths://opinion.bdnews24.com/bangla, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭, তথ্য সংগ্রহ: ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

[৩২] Tea garden workers: Living like slaves for 175 years, The Daily Star, মার্চ ০৯, ২০১৭, তথ্যের উৎস - http://www.thedailystar.net/country/tea-garden-workers-living-slaves-175-years-1262731, তথ্য সংগ্রহ: ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

[৩৩] ওদের জীবন এমন কেন?, ওয়াহিদ আবু এন এম, বিডি টুডে, ২৬ অগস্ট ২০১৬, তথ্যের উৎস - http://www.newsforbd.net/columndetail/detail/115/5751, তথ্য সংগ্রহ: ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

[৩৪] প্রথম আলো ও ইউএনএফপিএ আয়োজিত 'চা-বাগানে কর্মরত মায়ের প্রজননস্বাস্থ্যে সুরক্ষায় করণীয়' গোলটেবিল বৈঠক, ১৯ নভেম্বর ২০১৭, http://www.prothom-alo.com/, তথ্য সংগ্রহ: ২০ নভেম্বর ২০১৭ এবং ঢাকায় ৮ সেপ্টম্বর ২০১৩ তারিখে 'বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের উনসেপশন সেমিনার,

[৩৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন, প্রথম আলো, কমলগঞ্জে চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোস, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, ফটিকছড়ির চা-বাগানের ৭৪ জন নিখোঁজ -২৭ এপ্রিল ২০১৭, ধামাই চা বাগান মজুরি-রেশনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ - ১৮ জুলাই ২০১৬, ১০ দফা দাবিতে শ্রমিকদের একাংশের ধর্মঘট চলছে -১০ আগস্ট ২০১৪, ১২ দফা দাবিতে তিলকপুর চা-বাগানে ধর্মঘট -২৮ মে ২০১৩, শ্রীমঙ্গলে লাখাইছড়া চা-বাগানে শ্রমিকদের মানববন্ধন - ০১ আগস্ট ২০১৩, দুই চা শ্রমিক কারাগারে, আবার উত্তপ্ত হচ্ছে কালাগুল চা-বাগান - ০২ জুলাই ২০১৬, মৌলভীবাজারের তিনটি চা-বাগানে শ্রমিক ধর্মঘট - ০৫ মার্চ ২০১৫, চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি ৪০০ টাকা করার দাবি -২৪ আগস্ট ২০১৫, http://www.prothom-alo.com/, তথ্য সংগ্রহ: ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

প্রথাগত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং মূলধারার ২২৯টি চা বাগানের মধ্য হতে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের যে নয়টি বাগান রয়েছে সেগুলোর শ্রমিক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি প্রথাগত চা শ্রমিকদের থেকে মজুরি, বাসস্থান, শিক্ষা চিকিৎসাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ভিন্ন হওয়ায় এগুলোকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৩৬] এই গবেষণায় বাংলাদেশের প্রথাগত পদ্ধতি অনুসরণকারী চা-বাগানের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সীমাবদ্ধতা দেখার জন্য চা বাগানের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, চা শিল্প শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণ সেন্টার, চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়, চা বাগানের হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া চা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য চাকরি প্রাপ্তি, বাসস্থান, কাজের পরিবেশ, মজুরি, ভাতা, রেশন, সঞ্চয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সেবা, বাসস্থান, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাসন, শিশু সদন ও বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি ১.২: এক নজরে গবেষণার পরিধি

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
আইনের শাসন	চা শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং উপরে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাসমূহের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ ও বিরাজমান চিত্র
স্বচ্ছতা	অধিকার সম্পর্কে শ্রমিকদের তথ্য জানার ব্যবস্থা এবং বিরাজমান চিত্র
জবাবদিহিতা	বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উপ-শ্রম পরিচালকের কার্যালয়, ডিআইজি, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যালয়, ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা
সংবেদনশীলতা (responsiveness)	শ্রমিকদের জন্য অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা
দুর্নীতি প্রতিরোধ	বাগান কর্তৃপক্ষের প্রভাব বিস্তার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদি

১.৬. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ, দলীয় আলোচনা, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে ছিল সংশ্লিষ্ট আইন, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নথি, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টারি ও ওয়েবসাইট। আর প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে ছিল চা শিল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজন। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট টুলস ব্যবহার করা হয়েছে।

নিবিড় সাক্ষাৎকার ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে টিলা বাবু, চা শ্রমিক পঞ্চায়েতের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য, ভ্যালি সভাপতি, চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা ডাক্তার, চা বাগানের ম্যানেজার, কর্তৃপক্ষ, জাতীয় পর্যায়ের চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের প্রাক্তন ও বর্তমান ট্রাস্টি ও কর্মকর্তা, শ্রম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, চা বোর্ড, চা সংসদ, এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

জরিপ

[৩৬] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ০১ দেখুন। উক্ত তথ্যগুলো চা শ্রমিকের কথা, গাইন, ফিলিপ, পৃষ্ঠা ৫০ এবং উল্লাহ মো. রহমত, Story of the Tea Workers Subsistence against Hegemony, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮৭ -১৯৭ থেকে নেওয়া হয়েছে

এই গবেষণায় বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপকের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রথাগত ও মূলধারার মোট ২২৯টি (ফাড়ি বাগানসহ) চা বাগানের এক লক্ষ ১০ হাজার স্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ৬৪টি (২৮%) চা বাগানের ১৯১১ জন স্থায়ী শ্রমিকের নিকট থেকে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি বাগান থেকে মোট ৩০ জন স্থায়ী শ্রমিক গুচ্ছ নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে একটি বাগানে ৩০ জন স্থায়ী শ্রমিক না পাওয়ার কারণে এই বাগানে ২২ জন এবং একটি বাগানে ২৯ জন স্থায়ী শ্রমিকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে সর্বমোট ১৯১১ জন স্থায়ী শ্রমিকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাগান নির্বাচন

প্রতিটি জেলা থেকে আনুপাতিক হারে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক বাগান ও শ্রমিক নির্বাচন করা হয়েছে। এই জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি মালিকানা, বাগানের শ্রেণি (এ, বি ও সি) এবং প্রধান বাগান ও ফাড়ি বাগানের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

জরিপের উত্তরদাতা নির্বাচন

নির্বাচিত বাগানগুলোর আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করে মাঝামাঝি জায়গা থেকে শুরু করে প্রতি পাঁচ বাড়ি পর পর মোট ৩০ জন করে স্থায়ী শ্রমিকের পরিবারে গিয়ে স্থায়ী শ্রমিকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত পরিবারে অস্থায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকের তথ্যও জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

দলীয় আলোচনা

এই গবেষণায় মোট ৩৮টি দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। নারী ও পুরুষদের ভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনার জন্য ১৫টি দলীয় আলোচনা নারী শ্রমিকদের সাথে এবং ১৭টি দলীয় আলোচনা পুরুষ শ্রমিকদের সাথে এবং ৬টি দলীয় আলোচনা নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে মোট ৩৮০ জন শ্রমিকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ

এই গবেষণায় শ্রমিকদের বাসস্থান, চা বাগান, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের চিত্র দেখার জন্য মোট ৬৪টি বাগান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সারণি ১.৩: একনজরে তথ্য সংগ্রহের কৌশল, তথ্যের উৎস এবং তথ্য সংগ্রহের টুলস

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	তথ্যের উৎস	তথ্য সংগ্রহের টুলস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	টিলা বাবু, চা শ্রমিক পঞ্চায়েত, ভ্যালি সভাপতি, চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা ডাক্তার, চা বাগানের ম্যানেজার, কর্তৃপক্ষ, চা শ্রমিকদের ইউনিয়নের প্রতিনিধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের প্রাক্তন ও বর্তমান ট্রাস্টি ও কর্মকর্তা, শ্রম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, চা বোর্ড, চা সংসদ, এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি	**চেকলিস্ট**
দলীয় আলোচনা	**চা শ্রমিক (৩৮টি)**	চেকলিস্ট
পর্যবেক্ষণ	**শ্রমিকদের বাসস্থান, শৌচাগার, চা বাগান, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও শিশু সদন**	চেকলিস্ট
জরিপ	**চা শ্রমিক (১৯১১ জন স্থায়ী)**	**প্রশ্নপত্র**

১.৭. জরিপের প্রশ্নমালা প্রণয়ন

প্রথমে সাহিত্য পর্যালোচনা করে শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তার ওপরে একটি খসড়া প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। এটি প্রথমে প্রাক-যাচাই করা হয়। প্রথমবার প্রাক-যাচাই করার সময়ে প্রশ্নপত্রের ওপরে যে সব মতামত আসে তা প্রশ্নপত্রে সমন্বয় করে পুনরায় প্রাক-যাচাই করা হয়। দ্বিতীয় বার প্রাক-যাচাইয়ের পরে প্রশ্নপত্রটি চূড়ান্ত করা হয়। এই চূড়ান্ত প্রশ্নপত্রটির মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৮. তথ্য সংগ্রহকারী

এই গবেষণায় জরিপের তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত সনাক এলাকার স্বেচ্ছাসেবক দল (*ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট- ইয়েস*) থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ৩৪ জন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১১ জনসহ মোট ৪৫ জন সহকারী মাঠ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। এই মাঠ কর্মীদের প্রশ্নপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়।

১.৯. তথ্যের সত্যতা যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্যের মান অক্ষুণ্ন রাখতে এবং ভুল তথ্য পরিহার করতে টিআইবি'র ১১ জন গবেষক জরিপের তথ্য সংগ্রহকালীন সার্বক্ষণিকভাবে স্পট চেক করার জন্য মাঠে অবস্থান করে। এছাড়াও তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ প্রশ্নপত্র বেছে নিয়ে গবেষণা দল পুনরায় নিরীক্ষণ (ব্যাকচেক) করেন। মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদনা করে কোডিং করা হয়। জরিপে পাওয়া তথ্য সংরক্ষণ এবং সম্পাদনার জন্য স্ট্যাটিসটিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশ্যাল সাইন্স (এসপিএসএস) সফটওয়ারে ডাটাবেজ তৈরি করে এন্ট্রি করা হয়। পরবর্তীতে তথ্যগুলো আরো একবার যাচাই করে তা বিশ্লেষণ করে সারণি ও চিত্র আকারে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশীয় চা সংসদ (বিটিএ) ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে গবেষণা শুরু থেকে খসড়া প্রতিবেদনের ফলাফল নিয়ে কয়েকটি ধাপে মত বিনিময় করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনের তথ্যের ওপরে তাদের মতামত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.১০. গবেষণা কাল

এই গবেষণাটি মে ২০১৬ সালে শুরু করলেও বাগানে প্রবেশ করে চা শ্রমিকদের নিকট থেকে জরিপ এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের অনুমতি না দেওয়ায় জরিপের তথ্য সংগ্রহ মে ২০১৬ সময় থেকে শুরু করা সম্ভব হয়নি। গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহের কাজ আগস্ট ২০১৭ শুরু হয় এবং আগস্ট ২০১৮ সাল পর্যন্ত এর কার্যক্রম চলে। আর জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয় আগস্ট ২০১৭ থেকে মে ২০১৮ সময়ের মধ্যে।

১.১১. প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জরিপে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের খানার আর্থ-সামাজিক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তি ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার এবং চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে সুশাসনের বিরাজমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক পরিচিতি

ভূমিকা

চা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বিরাজ করছে তা উপস্থাপনের পূর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ তাদের লিঙ্গ পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের আকার, তাদের পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, তাদের শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আয়-ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানার মাধ্যমেই তাদের সচেতনতার পর্যায় ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন সম্ভব। এ অধ্যায়ে শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টাই করা হয়েছে।

৩.১. উত্তরদাতার পরিচিতি

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৩.২% ছিল নারী ও ৪৬.৮% ছিল পুরুষ। বেশিরভাগ উত্তরদাতার বয়সই ২৮ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে এবং এদের হার ৫৬.৬%। ১৮ বছরের নীচে রয়েছে ০.৫% এবং ৫৮ বছরের উপরে রয়েছে ৮.০৫% উত্তরদাতা।[৩৭] যেসব উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন (৩৭.৯%) ও নিরক্ষর (৩৬.৬%)। অন্যান্যদের মধ্যে ২১.৮% প্রাথমিক শিক্ষা পাশ, ৩.০% এসএসসি ও ০.৭% এইচএসসি পাস।[৩৮] উত্তরদাতাদের ১৮% জানান যে তারা পঞ্চায়েত সদস্য।

৩.২. খানা সদস্যদের লিঙ্গ পরিচয় ও পরিবারের আকার

জরিপে যেসব শ্রমিকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের খানার সদস্যদের মধ্যে ৫০.৬% পুরুষ এবং ৪৯.৪% নারী। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৮ জন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৫৪.০%) খানায় পাঁচ থেকে আট জন সদস্য বসবাস করে।

চিত্র ৩.১: খানার সদস্য সংখ্যার চিত্র

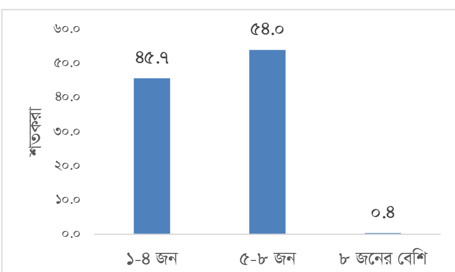

৩.৩. খানা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে দেখা গেছে শ্রমিকদের খানার সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা সাক্ষরজ্ঞান (৩৬.৬৫%)। এরপরেই রয়েছে নিরক্ষর খানা সদস্য, ৩৩.০৬%। অর্থাৎ ৬৯.৭১% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। এছাড়া ২৪.৬৬% প্রাথমিক শিক্ষা পাশ, ৩.১৭% এসএসসি পাশ ও ২.৪৭% উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বা স্নাতক বা

সারণি ৩.১: খানা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	নারী (%)	পুরুষ (%)	সার্বিক (%)
নিরক্ষর	৩৯.০১	২৭.২৫	৩৩.০৬
সাক্ষরজ্ঞান	৩৩.৬৯	৩৯.৫৩	৩৬.৬৫
প্রাথমিক	২২.৪২	২৬.৮৪	২৪.৬৬
এসএসসি	২.৮১	৩.৫১	৩.১৭
এইচএসসি ও তার ওপরের শিক্ষাগত যোগ্যতা	২.০৭	২.৮৬	২.৪৭

[৩৭] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ২ দেখুন
[৩৮] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৩ দেখুন

স্নাতকোত্তর পাশ।

৩.৪. খানা সদস্যদের বয়স

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদস্যের (২৩.৩%) বয়স ১০ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। এছাড়া ১৯.১% সদস্যদের বয়স ০ থেকে ৯ বছর, ১৬.৯% এর বয়স ২০ থেকে ২৯ বছর।[৩৯]

৩.৫. খানা সদস্যদের পেশা

জরিপে অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের খানার সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৩৫.৪%) হচ্ছে চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক। এরপরেই রয়েছে শিক্ষার্থীদের অবস্থান, ২৬.৩%।

চিত্র ৩.২: খানার সদস্যদের পেশা (শতকরা)

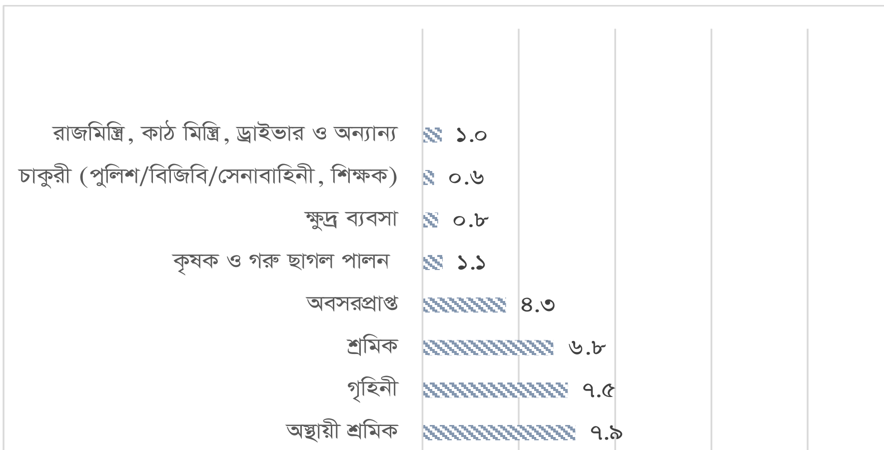

৩.৬. খানার ৬-১২ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ও পেশা

চিত্র ৩.৩: ছয় থেকে ১২ বছর বয়সী শিক্ষা থেকে বাদ পরা শিশুদের পেশা

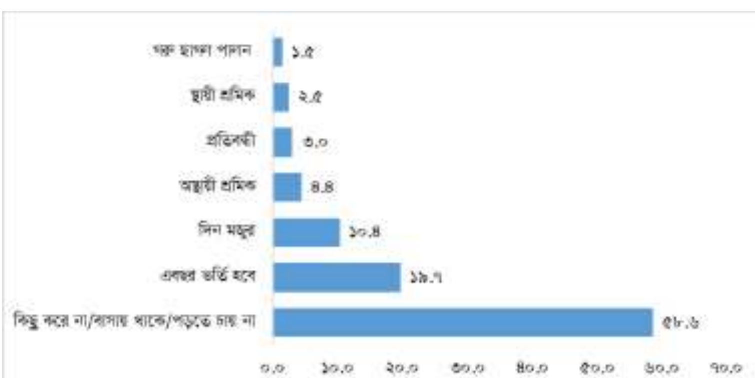

জরিপকৃত ৫১.৪% খানায় ৬ থেকে ১২ বছরের শিশু রয়েছে মোট ১৪৩৩ জন, যাদের মধ্যে প্রায় ১৫.৮% শিশুই স্কুলে পড়ালেখা করতে যায় না। এসব শিশুদের মধ্যে ৫৮.৬% বাসায় থাকে কিছু করে না। ১৯.৮% শিশুকে এবছরে ভর্তি করানো হবে বলে জানিয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে ১০.৪% দিনমজুর, ২.৫% চা বাগানের স্থায়ী এবং ৪.৪% অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে।

[৩৯] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৪ দেখেন

৩.৭. চা শ্রমিকদের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার

দেশের বিবাহ আইন অনুসারে মহিলাদের ১৮ বছর এবং পুরুষদের ২১ বছর হলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে।

চিত্র ৩.৪: চা শ্রমিকদের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার

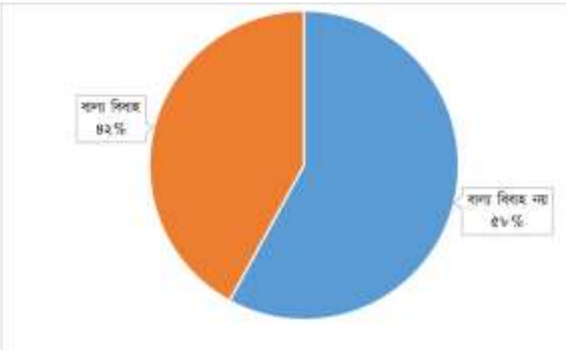

এ হিসেবে জরিপে দেখা গেছে অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতার খানার বিবাহিত সদস্যদের ৪২% বাল্য বিবাহ করেছে। বাল্য বিবাহের হার পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশি। নারীদের মধ্যে ৫৩.৯% এবং পুরুষদের মধ্যে ২৯.০% সদস্যদের বাল্য বিবাহ করার তথ্য পাওয়া যায়।

দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে অনেকে মেয়ের বয়স বেশি দেখিয়ে বিয়ে দেয় যাতে বাল্য বিবাহ কম দেখানো হয়। পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ বিষয়টি দেখভাল করলেও এখনও বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। অনেক পরিবার তার ছেলেমেয়েদের জন্ম নিবন্ধনে বয়স বাড়িয়ে নিয়ে তারপর বিয়ে দেয়। তবে দিনে দিনে বাল্য বিবাহের হার কমছে বলে তথ্যদাতারা জানান।

৩.৮. চা শ্রমিক পরিবারের মাসিক আয় ও ব্যয়

চিত্র ৩.৫: চা শ্রমিক পরিবারগুলোর মাসিক আয়

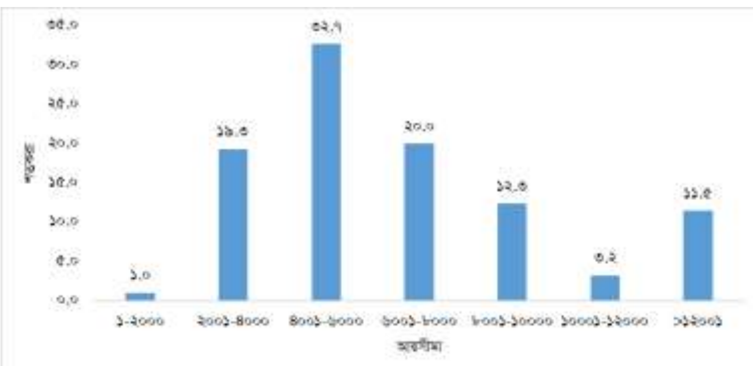

জরিপের দেখা গেছে উত্তরদাতাদের খানার গড় আয় ৬৯৯৩ টাকা। বেশিরভাগ চা শ্রমিক পরিবারগুলোর আয় ৪০০০ থেকে ৬০০০ টাকার মধ্যে। চা শ্রমিকদের পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ৬২৮৪ টাকা। সবচেয়ে বেশি চা শ্রমিক পরিবারের মাসিক ব্যয়ও ৪০০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকার মধ্যে যার হার ৩৪.৮%[৪০]।

৩.৯. বাগান হতে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে চা শ্রমিকদের সচেতনতা

চিত্র ৩.৬: বাগান হতে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে চা শ্রমিকদের সচেতনতা

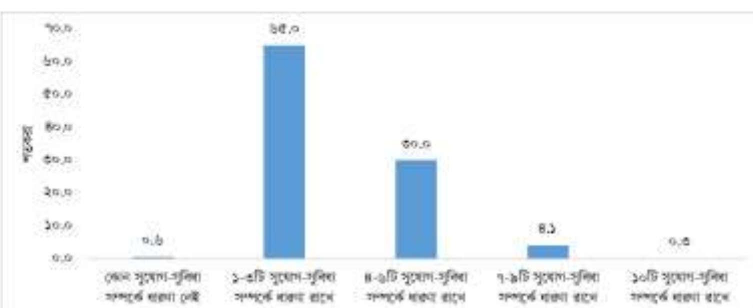

চা শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা (৬৫.০%) জানান যে তারা এক থেকে দুইটি সুবিধা বা অধিকার সম্পর্কে জানেন। চার থেকে ছয়টি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা আছে ৩০.০%, সাত থেকে নয়টি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানেন বা ধারণা রাখেন ৪.১% উত্তরদাতা। তবে প্রায় .৬% শ্রমিক তাদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জরিপে উঠে আসে।

[৪০] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৫ দেখুন

৩.১০. উত্তরদাতার কাজের ধরন, তাদের চুক্তির ধরন ও পঞ্চায়েতের সাথে সংশ্লিষ্টতা

জরিপে অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের সবচেয়ে বেশি (৫০.২%) শ্রমিক চা পাতা উত্তোলনের কাজ করে। এছাড়া ৭.৬% শ্রমিক আগাছা পরিষ্কার, ৬.১% কীটনাশক ছিটানো, ৫.৮% চারা রোপণ, ৪.৬% সর্দার, ৩.৬% কারখানা শ্রমিক, ৩.১% প্রহরীর কাজ করে থাকে। ১৯.০% অন্যান্য যেমন - স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ, ইলেকট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রি, ট্রাক্টর চালক, মালি, পাতা ধোয়া গৃহ পরিচারিকা ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে ১০.৩% শ্রমিক চা বাগানের কাজের বাইরেও অন্যান্য কাজের পেশার সাথে জড়িত আছে।

চিত্র ৩.৭: উত্তরদাতার কাজের ধরন

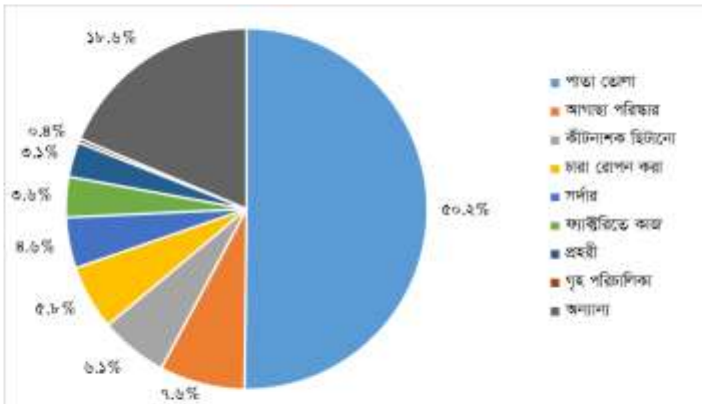

জরিপে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ৯৭.৬% শ্রমিক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। মাসিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হলে তাদেরকে কিছু কিছু সুবিধা বেশি দিতে হয় বলে বেশিরভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের নিয়োগ করে থাকেন। শ্রমিকদের দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ দিলে মাসিক ২৫৫০ টাকা দিতে হয়। আর মাসিক ভিত্তিতে নিয়োগ দিলে মাসিক ৪৫০৪ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮.০% বাগান পঞ্চায়েতের সদস্য।

চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের বেশিরভাগ উত্তরদাতার বয়স ২৮ থেকে ৪৮ বছরের মধ্যে, তারা বেশিরভাগই স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। তবে তাদের বড় একটি অংশ এখনও নিরক্ষর। তাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা চা পাতা উত্তোলনকারী। উত্তরদাতাদের খানার ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের পরিবারগুলোতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানায় ৪ থেকে ৬ জন শ্রমিক বসবাস করে এবং তারা বেশি সংখ্যক পুরুষ সদস্য। তাদের খানার সদস্যদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্য চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি সদস্যের বয়স ১০ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। তবে বেশিরভাগ খানা সদস্য স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বা নিরক্ষর। উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশিরভাগ শ্রমিকই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক মাত্র ২ থেকে ৩টি অধিকার সম্পর্কে জানে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়: আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

চা শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩, ২০১৮), শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এবং শ্রমিকদের সাথে চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে দুই বছর অন্তর যে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাই কার্যকর করার মাধ্যমেই তা ন্যায্যতা পায়। কিন্তু উক্ত আইন ও বিধিমালা বিশ্লেষণে দেখা গেছে চা শ্রমিকদের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিরাজমান যা তাদের অধিকার প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করছে। এই অধ্যায়ে উক্ত সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১.১ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)

- শ্রম আইনের ৩২ নম্বর ধারার (১) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কোনো শ্রমিকের চাকুরির অবসান হইলে, তাহা যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন, তিনি তাহার চাকরির অবসানের ষাট দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাকে বরাদ্দকৃত বাসস্থান ছাড়িয়া দিবেন।'[৪১] অন্যদিকে, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর তফসিল ৫ এর ধারা ৭ এর উপধারা ৬ উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো শ্রমিক ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত হলে এক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত আবাসস্থল ছাড়িয়া দিবেন। অর্থাৎ আইনে উল্লেখ রয়েছে ষাট দিন আর বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে এক মাস যা এক ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে।

- শ্রম আইনের ৯৯ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে, যেসকল প্রতিষ্ঠানে অন্যুন ২০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছেন, সেখানে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রুপ বীমা চালু করিতে পারিবে। কিন্তু চা বাগানে এ ধরনের কোনো গ্রুপ বীমা এখনও চালু করা হয়নি। 'গ্রুপ বীমা চালু করিতে পারিবে' উল্লেখ করার কারণে গ্রুপ বীমা চালু করার কোনো বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়নি।

- এই আইনের ১১৫ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাবার অধিকারী হবেন, এবং উক্ত ছুটি কোনো কারণে ভোগ না করলে জমা থাকবে না এবং কোনো বৎসরের ছুটি পরবর্তী বৎসরে ভোগ করা যাবে না।' *তবে শর্ত থাকে যে এই ধারার কোনো কিছুই চা-বাগানের অধীনে নিযুক্ত কোনো শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।'*[৪২] এখানে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য শ্রমিকদের ছুটির বিষয়ে যেসব নিয়ম অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে চা শ্রমিকদের জন্য তা প্রযোজ্য হচ্ছে না।

- এই আইনের ১১৭ ধারার (১) এ উল্লেখ রয়েছে যে, 'কোনো দোকান বা বাণিজ্য বা প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো কারখানা অথবা কোনো সড়ক পরিবহন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রতি ১৮ দিন কাজের জন্য একদিন; এবং কোনো চা বাগানের ক্ষেত্রে প্রতি বাইশ দিন কাজের জন্য একদিন; কোনো সংবাদপত্র শ্রমিকের ক্ষেত্রে, প্রতি এগার দিন কাজের জন্য একদিন ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে'।[৪৩] এখানেও দেখা যাচ্ছে অন্যান্য শ্রমিকের তুলনায় চা বাগানের শ্রমিকদের সাথে বৈষম্য করা হয়েছে।

- এই আইনের ধারা ২৩৪ এর (১) এর (খ) অনুসারে প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিলে ৮০:২০ অনুপাতে প্রদান করবে। আবার ধারা ২৪২ এর (১) এ উল্লেখ করা হয় অংশগ্রহণ তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থের দুই তৃতীয়াংশ সমান অনুপাতে সকল শ্রমিকগণের মধ্যে নগদে বণ্টন করা হবে। বাকি অর্থ বিনিয়োগ করা হবে এবং তার থেকে প্রাপ্ত মুনাফাও শ্রমিকগণের মধ্যে সমান অনুপাতে বণ্টন করা হবে। কিন্তু কোনো চা বাগানেই এই শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিলের অর্থ জমা করা হয় না ফলে এর সুফল শ্রমিকরা এখনও ভোগ করতে পারছে না।

- শ্রম আইনের ১৫২ এর ২ ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট পঞ্চম তফসিলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে অর্থ দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা খুবই সামান্য। এখানে উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো শ্রমিকের মৃত্যুজনিত কারণে মাত্র ২ লক্ষ টাকা, স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার কারণে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং অস্থায়ী অক্ষমতার কারণে অক্ষমতার মেয়াদকালের জন্য অথবা এক বৎসর পর্যন্ত যা কম হইবে সেই

[৪১] বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[৪২] বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[৪৩] বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিমাণ দেওয়া হবে। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন শ্রীলংকায় মৃত্যুজনিত ও স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ ৫ লাখ ৫০ হাজার রূপি।[৪৪]

২.১.২ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫

- শ্রম আইনের ২৬৩ (২) এ অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাদের চাকরি ২ বছর সম্পন্ন করে নিজ থেকে অবসরে গেলে তার জমানো ভবিষ্য তহবিলের টাকার সাথে মালিকের অংশও সম্পূর্ণ পাবে। কিন্তু ২৯৩ (৩) চা শ্রমিকদের জন্য তা বিভিন্ন মাত্রায় ভেঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে ২ বছর পূর্ণ করলেও তাদের ভবিষ্য তহবিলের টাকা নিজের জমানো অংশ ও মালিকের পুরো অংশ না দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কোনো সদস্যের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে : (ক) তহবিলে তাহার সদস্য পদের মেয়াদ তিন বৎসরের কম হইলে মুনাফাসহ মালিকের অংশের শতকরা ৫০ ভাগ তহবিলে বাজেয়াপ্ত হইবে; (খ) তহবিলে তাহার সদস্য পদ তিন বৎসরের অধিক কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম হইলে মালিকের অংশের শতকরা ২৫ ভাগ বাজেয়াপ্ত হইবে; (গ) পাঁচ বৎসরের অধিক কিন্তু দশ বৎসরের কম হইলে মালিকের অংশ ১৫% বাজেয়াপ্ত হইবে।

- চা শ্রমিকদের চিকিৎসার বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ৯৬, তফসিল ৫ এর ৬ (ক) - এ প্রত্যেক চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের ও পরিবারবর্গের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চিকিৎসার সুযোগ থাকতে হবে।[৪৫] কিন্তু বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে যেসব চিকিৎসা নেই তার জন্য কখনও শ্রমিকদের বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হলে তার ব্যয় কে বহন করবে সে বিষয়ে কোনো নিয়ম, আইন বা বিধিমালায় উল্লেখ নাই। আবার বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে যে, প্রতিটি বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, এক্স-রে বিভাগ ও ফিজিক্যাল থেরাপি বিভাগ থাকতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতেই আবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ যদি মহাপরিদর্শকের অনুমোদিত অন্য কোনো হাসপাতালে সন্তোষজনক ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে এক্স-রে ও ফিজিক্যাল থেরাপি বিভাগ না হইলেও চলবে। এর মাধ্যমে বাগান কর্তৃপক্ষের উক্ত বিভাগ তৈরির বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে।

- ধারা ৯৬, তফসিল ৫ এর ২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, ৪০০ জনের কম শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে এরূপ প্রত্যেক বাগানে মহাপরিদর্শকের অনুমতি সাপেক্ষে একজন সার্বক্ষণিক মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ডিসপেনসারি থাকতে হবে এবং উক্ত ডিসপেনসারিতে মহপরিদর্শকের অনুমোদিত নির্দিষ্ট সংখ্যক শয্যা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে মহাপরিদর্শকের অনুমোদন নিয়ে শয্যা সংখ্যা থাকার বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকছে না। অর্থাৎ মহাপরিদর্শকের অনুমোদন নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানে ডিসপেনসারিতে শয্যার ব্যবস্থা না করলেও পারে। আবার অনুমোদন সাপেক্ষে কয়টি শয্যা থাকতে হবে সে বিষয়টিও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া শর্ত রয়েছে যে, কোনো মেডিক্যাল স্টাফ না পাওয়া গেলে বাগান কর্তৃপক্ষ মহাপরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে একজন সার্বক্ষণিক যোগ্য কম্পাউন্ডার নিয়োগ করবেন। এই ধারায় মহাপরিদর্শকের অনুমোদন কথাটি উল্লেখের মাধ্যমে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে। ফলে প্রায় প্রতি বাগানেই দেখা গেছে মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট না রেখে কম্পাউন্ডার বা ড্রেসার দ্বারা কাজ চালাচ্ছে।

- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ৯৬, তফসিল ৫ এর ৩ ধারার (ক) এ উল্লেখ রয়েছে যে, বাগান মালিকগণ কর্তৃক যৌথভাবে গ্রুপ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। এখানে যাইতে পারে কথাটির মাধ্যমে বাধ্যবাধকতার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে। ফলে বাগান কর্তৃপক্ষ যৌথ হাসপাতাল গঠনের কোনো আগ্রহ বোধ করে না। পুরো চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য মাত্র দুইটি গ্রুপ হাসপাতাল রয়েছে। আবার শ্রম বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবে। কিন্তু কোন কোন সেবা কতটুকু মাত্রায় দেওয়া হবে তার সীমা উল্লেখ না থাকায় বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিলে তার ব্যয় ভার শ্রমিকরা দাবি করতে পারে না।

- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ৯৬, তফসিল ৫ এর ৭ (১) নম্বর বিধির (ঘ) উল্লেখ রয়েছে যে, আবার বিধিমালায় আবাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "প্রতি বৎসর বসবাসকারী শ্রমিকের শতকরা অন্তত দশ ভাগ শ্রমিকের জন্য অনুরূপ 'মির্তিঙ্গা টাইপ'

---

[৪৪] অধিক জানতে ভিজিট করুন

http://www.compensation.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=724&lang=en

[৪৫] বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ৯৬, তফসিল ৫ বিধি ৬ এর (১) ও (২)

গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে"। কিন্তু 'মির্তিঙ্গা টাইপ' এর কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় শ্রমিকরা কোন ধরনের ঘর পাবার অধিকারী হবে তা জানতে পারে না। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মির্তিঙ্গা বাগানের কিছু ঘর মেঝে ও দেয়াল মাটি ও চাল টিনের তৈরি, কিছু ঘর মেঝে ও দেয়াল পাকা ও চাল টিনের তৈরি। এক্ষেত্রে কোন ঘরগুলোকে উক্ত মির্তিঙ্গা টাইপ বলা হবে তার কোনো ব্যাখ্যা আইন বা বিধিমালার কোনোটিতেই উল্লেখ নাই। ফলে তারা অনেক সময় প্লাস্টিকের চালাযুক্ত ঘর নিতেও বাধ্য হয়। বিধিমালা (চ) এ আরো উল্লেখ করা হয়েছে, "লিখিতভাবে রেকর্ডকৃত সন্তোষজনক কারণে মহাপরিদর্শকের মতামতের ভিত্তিতে সরকার নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকদের জন্য 'মির্তিঙ্গা টাইপ' গৃহ নির্মাণের বিধান শিথিল করিতে পারিবে।" এক্ষেত্রে 'সন্তোষজনক কারণ' কথাটির কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ না থাকা এবং 'মহাপরিদর্শকের মতামতের ভিত্তিতে' কথাটি উল্লেখের মাধ্যমে মালিকদের 'নির্দিষ্ট সংখ্যক' ও 'মির্তিঙ্গা টাইপ' গৃহ নির্মাণ উভয় ধরনের বিষয়গুলোকে শিথিল করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, বিধি ৯৬ তফসিল ৫ ধারা ৭ এর (২) উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিক সামগ্রিক পানীয় জলের সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে পানীয় জলের জন্য অন্তত পক্ষে ২৫ পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ বা ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়ার ব্যবস্থা রাখবেন। কুয়াতে দুটি হস্তচালিত পাম্প থাকতে হবে এবং উক্ত কুয়াটি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এই কুয়ার পানি ব্যবহারের উপযোগি কিনা সে সম্পর্কে সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য মালিককে লিখিত নির্দেশ দিতে পারবে। 'কুয়ার পানি ব্যবহারের উপযোগী কিনা সে সম্পর্কে সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য মালিককে লিখিত নির্দেশ দিতে পারবে' -এ কথা উল্লেখ থাকলেও পানী ব্যবহার উপযেগী কিনা তা পরীক্ষা করার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া বাগান কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন সংগ্রহের বিষয়েও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে বাগান কর্তৃপক্ষ কখনই এই পানি বিশুদ্ধ কি না সে বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয় না। আবার কুয়ার পানি বিশুদ্ধ না হলেও নলকূপের বিকল্প হিসেবে কুয়ার কথা উল্লেখ থাকায় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পানীয় জলের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করা থেকে বিরত থাকতে পারে।

- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ৯৬, তফসিল ৫ এর ১০ নম্বর বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'এই তফসিলে বর্ণিত বিধানসমূহ কার্যকরকরণে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে মালিক লিখিতভাবে মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন এবং এই বিষয়ে মহাপরিদর্শকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। কিন্তু উক্ত তফসিলে শ্রমিক পক্ষের কোনো সমস্যা হলে তা মহাপরিদর্শককে জানানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় আইন ও বিধিমালায় চা শ্রমিকদের জন্য এমন কিছু বৈষম্যমূলক বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় তাদের বঞ্চিত করছে। আবার এমনভাবে তাদের সুযোগ-সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যা তাদের অনেক সুবিধা পাওয়ার ন্যায্যতাই দেয় না। ফলে তারা এই সুবিধাগুলো পাওয়ার দাবিও করতে পারে না যা তাদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

চতুর্থ অধ্যায়: কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করণ ও অধিকার প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জসমূহ

ভূমিকা

বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ব্রিটিশ আমল থেকেই চা শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। চা বাগান গঠনের প্রথম দিকে শ্রমিকদের কি পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে তার আইনগত কোনো ভিত্তি ছিল না। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তা কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। শ্রমিক বঞ্চনার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) রয়েছে, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ রয়েছে এবং শ্রমিকদের সাথে কর্তৃপক্ষদের সমঝোতা চুক্তি রয়েছে যার মাধ্যমে শ্রমিকরা কিছুটা হলেও তাদের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা পায় এবং পরিমাপ করতে পারে যে তারা তাদের আইনগত অধিকারের কতটুকু পাচ্ছে এবং কতটুকু বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্তমান উপ-শ্রম পরিচালকের কার্যালয়, প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অফিসগুলোও কর্মরত রয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে শ্রমিকরা তাদের সুযোগ-সুবিধার কতটুকু পাচ্ছে কিংবা পাচ্ছে না এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দায়িত্ব কতটুকু সফলভাবে পালন করছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.১. চাকরি স্থায়ীকরণ

শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৪ (৭ ও ৮) অনুযায়ী একজন শ্রমিক তিন মাস সন্তোষজনক শিক্ষানবিশ কাল পার করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পাবেন।[৪৬] কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে বর্তমানে বেশিরভাগ বাগানে অনেক বছর ধরে নিয়মিত স্থায়ীকরণ বন্ধ রয়েছে। অধিকাংশ বাগানে দেখা যায় অনেক শ্রমিক বছরের পর বছর ঠিকা (অস্থায়ী) হিসেবে কাজ করে গেলেও তাদেরকে স্থায়ী করা হয়নি। অনেক আগে যখন বাগানগুলোতে শ্রমিক নেওয়া হত, তখন সরাসরি স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হত। আসলে তখন স্থায়ী বা অস্থায়ী এমন কোন ধারণার প্রচলনও ছিল না। যে শ্রমিকই কাজে যোগ দিত, তাকে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুবিধা দেওয়া হত। তখন অস্থায়ী শ্রমিক বলে কিছু ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন অনেক বাগানে দেখা যায় স্থায়ী শ্রমিকের চেয়ে অস্থায়ী শ্রমিকই বেশি। কারণ স্থায়ী করলে তাদের মজুরির পাশাপাশি অন্যান্য অনেক সুবিধাদি যেমন - রেশন, বাসস্থান, শিক্ষা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মজুরি ইত্যাদি দিতে হয়। শুধু দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগানো অনেক লাভজনক বিধায় বাগানগুলো এখন একজন স্থায়ী শ্রমিকের পরিবর্তে কেবল ওই পরিবারের আরেকজন অস্থায়ী শ্রমিককে স্থায়ী করছে। বছরের পর বছর অনেক শ্রমিককে অস্থায়ী হিসেবে কাজ করলেও বছরে সাত মাসের বেশি এসব শ্রমিকের কাজ থাকে না, এ অজুহাতে বাগান কর্তৃপক্ষ নতুন করে অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে থেকে স্থায়ী করছে না। অধিকাংশ বাগানের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। তথ্যদাতাদের মতে বাগানগুলো ১০ থেকে ৪৫ বছর ধরে সরাসরি নতুন করে কোনো শ্রমিককে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে না। কেবলমাত্র কোনো স্থায়ী শ্রমিক অবসর নিলে বা মারা গেলে কিংবা কাজ করতে অক্ষম হলে তাঁর স্থানে তার পরিবারের সক্ষম অন্য কাউকে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে।

৪.১.১. স্থায়ী হবার ধরন

চিত্র ৪.১: শ্রমিকদের স্থায়ী হবার ধরন

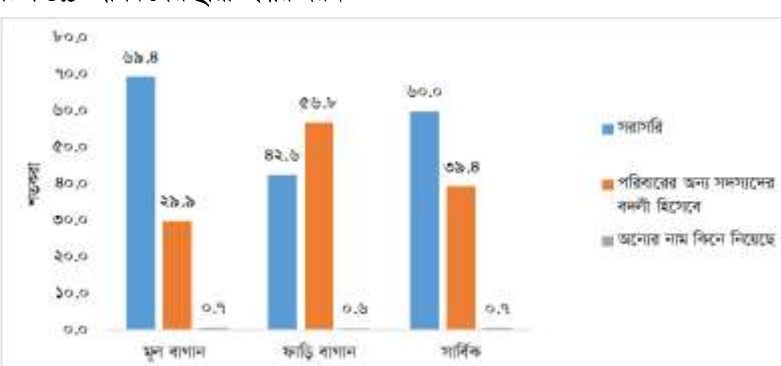

জরিপে দেখা গেছে উত্তরদাতাদের (স্থায়ী শ্রমিক) মধ্যে ৬০.০% শ্রমিককে সরাসরি স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৩৯.৪% পরিবারের অন্য সদস্যের বদলি হিসেবে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং .৭০% শ্রমিক অন্যের নাম কিনে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই চাকরি স্থায়ীকরণেও সময়ক্ষেপণ ও গড়িমসি করার তথ্য পাওয়া যায়। বদলি হিসেবে যারা স্থায়ী

[৪৬] বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)

হয়, তাদেরকে কোনো টাকা পয়সা দিতে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত, বাগানের ম্যানেজার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

স্থায়ী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের (৪২.৬%) তুলনায় মূল বাগানের (৬৯.৪%) শ্রমিকরা সরাসরি বেশি নিয়োগ পেয়েছেন। আবার পরিবারের অন্য সদস্যের বদলি হিসেবে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের শ্রমিকরা (৫৬.৮%) মূল বাগানের (৪২.৬%) তুলনায় বেশি নিয়োগ পেয়েছে। অর্থাৎ মূল বাগানে সরাসরি স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ হলেও ফাড়ি বাগানে তার হার কম।

৪.১.২. স্থায়ী হতে অনিয়ম ও সমস্যাসমূহ

স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে ৪৪.২% শ্রমিকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন যা মূল বাগান (৪৫.০%) ও ফাড়ি বাগানে (৪২.৭%) প্রায় একইরকম। এসব শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগ শ্রমিক (৯৪.৪%) জানান যে তাদের স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পেতে সময় অনেক বেশি লেগেছে। এসব শ্রমিকদের গড়ে ৬ বছর পর্যন্ত সময় লেগেছে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে। এছাড়া অন্যান্য শ্রমিকদের অন্য মানুষের সহায়তা নেওয়া ২.৫%, ঘুষ দেওয়ার (০.৬%) তথ্যও জরিপে উঠে আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য মানুষের সহায়তা নেওয়া ও সময় বেশি লাগা (২.০%) কিংবা ঘুষ দেওয়া ও সময় বেশি লাগা উভয় ধরনের সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে মানুষের সহায়তা নেওয়ার হার মূল বাগানেই বেশি। ফাড়ি বাগানে যেহেতু পরিবারের অন্য সদস্যদের বদলি হিসেবে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়ার হার বেশি সেহেতু তাদের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগলেও অন্য সদস্যদের সহায়তা লাগেনি।[৪৭] প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যেসব শ্রমিক বলেছেন যে তাদের স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পেতে সময়ক্ষেপণ[৪৮] হয়েছে তাদের মধ্যে ২২.৭% শ্রমিকের দুই বছর পর্যন্ত অস্থায়ী হিসেবে কাজ করে স্থায়ী হতে হয়েছে। ৪০.০% শ্রমিকের ২ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত সময় অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। কোনো কোনো শ্রমিককে স্থায়ী হতে ৪০ বছর পর্যন্ত সময় লেগেছে বলে জরিপে তথ্য পাওয়া যায়। আর যাদের ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের গড়ে ৫৪৪০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে যা তারা বাগান পঞ্চায়েত, শ্রমিক ইউনিয়নের লোক ও বাগানের কর্মকর্তাদের দিয়েছেন।

সারণি ৪.১: স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে সময়ক্ষেপণ

সময়ক্ষেপণ (বছরে)	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
৩ মাস থেকে ২ বছর	২১.০	২৬.১	২২.৭
২-৪	২০.০	২৩.২	২১.১
৪-৬	২০.০	১৬.৯	১৮.৯
৬-৮	১০.৩	৭.০	৯.২
৮-১০	১০.৭	৬.৭	৯.৩
১০-১২	৩.৯	২.১	৩.৩
১২-১৪	৩.৬	৪.২	৩.৮
১৪-১৬	৩.০	৩.২	৩.১
১৬-১৮	১.১	১.৪	১.২
১৮-২০	১.৯	২.১	২.০
>২০	৪.৫	৪.২	৪.৪
মনে করতে পারেনি	০.০	২.৮	১.০

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ১৪টি বাগানে সকল অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্য থেকে বছরে ১০ থেকে ১২ জনকে সরাসরি স্থায়ী করা হচ্ছে বলেও তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও কিছু অনিয়মের কথা গবেষণায় উঠে আসে। এ ধরনের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে বাগান পঞ্চায়েতের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। তাই যাদের সাথে পঞ্চায়েতের সম্পর্ক ভালো রয়েছে পঞ্চায়েত শুধু তাদের নাম সুপারিশ করে। অনেক ক্ষেত্রে এই সুপারিশের জন্য টাকার লেনদেন হয় বলে জানান তথ্যদাতারা। এই টাকার পরিমাণ ১২০০ থেকে ৭০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত হয় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এমন স্থায়ীকরণের বিষয়ে প্রভাব খাটিয়ে থাকে। শ্রমিকদের স্থায়ী করার বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের সংগঠন বাংলাদেশ চা সংসদ (বিটিএ)'র মতে, অস্থায়ী শ্রমিকদের যেহেতু সব সময় কাজ করানোর প্রয়োজন হয় না এবং স্থায়ী করলে তাদের অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হয় সেহেতু তারা স্থায়ী করার প্রতি খুব আগ্রহী হয় না। তবে তিনটি বাগানে কোনো অস্থায়ী শ্রমিক দ্বারা কাজ করানো হয় না।

[৪৭] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৬ দেখুন

[৪৮] যারা তিন মাসের বেশি সময় পরে স্থায়ী হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেই সময়ক্ষেপণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে

৪.১.৩. অন্যের নাম কিনে স্থায়ী হওয়া

শ্রমিকদের বাগানে স্থায়ী হওয়ার আর একটি পদ্ধতি হল নাম কেনা। কোনো কোনো স্থায়ী শ্রমিক যদি স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিতে চায় তখন সে তার স্থানে অন্য কারো নাম টাকার বিনিময়ে স্থায়ী তালিকায় তুলে দেবার জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে পঞ্চায়েতের সুপারিশসহ অনুরোধ জানায়। তখন বাগান কর্তৃপক্ষ পুরাতন স্থায়ী শ্রমিকের নাম বাদ দিয়ে নতুন শ্রমিকের নাম স্থায়ী তালিকায় তুলে দেয়। আর যে শ্রমিক এই নাম কিনে স্থায়ী হয় তারা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পায় না সেহেতু তারা বাধ্য হয়েই উক্ত নাম কিনে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে চায়। জরিপে দেখা গেছে প্রায় .৭% শ্রমিক অন্যের নাম কিনে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। এমন নাম বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা থেকে ৩৫০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ লেনদেন হয় বলে জরিপে তথ্য পাওয়া যায়।

৪.২. স্থায়ী হিসেবে নিয়োগের প্রমাণ হিসেবে নথি সরবরাহ ও সার্ভিস বই সংরক্ষণ

৪.২.১. স্থায়ী হিসেবে নিয়োগের প্রমাণ হিসেবে নথি সরবরাহ

বাংলাদেশ শ্রম আইনে কোনো কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্র প্রদান না করে কোনো শ্রমিককে নিয়োগ করিতে পারবে না এবং নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে।[৪৯] কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে কোনো বাগানেই কোনো নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় না।

চিত্র ৪.২: স্থায়ী হওয়ার সময় প্রদেয় দলিল

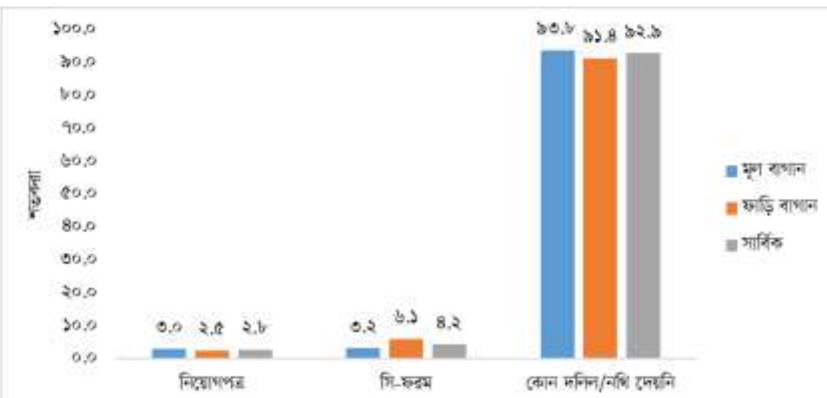

অন্যদিকে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ১২নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো শ্রমিক স্থায়ী হিসেবে নিয়োগের সময় একটি সি ফরম দেওয়া হবে যা নিয়োগপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু জরিপে দেখা গেছে যেসব শ্রমিকদের স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের স্থায়ী করার সময়ে ৯২.৯% কে কোনো নথি সরবরাহ করা হয়নি। মাত্র ৪.২% শ্রমিকদের সি-ফরম দেওয়া হয়েছে এবং ২.৮% শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।

৪.২.২. সার্ভিস বই সংরক্ষণ

শ্রম আইনের ৬, ৭ ও ৮ ধারায় শ্রমিকদের নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি সার্ভিস বই সংরক্ষণ করার নিয়ম রয়েছে। উক্ত সার্ভিস বই কর্তৃপক্ষ কোনো শ্রমিকের চাকরির শুরুতে এবং তার চাকরি চলাকালীন তার সম্পর্কে সার্ভিস বইয়ে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন এবং কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক উভয়ই তাতে দস্তখত করবেন।[৫০] প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে মাত্র ১.৩% উত্তরদাতা জানান যে তাদের জন্য সার্ভিস বই চালু রয়েছে। ৭৫.৯% উত্তরদাতা জানান যে, তাদের বাগান কর্তৃপক্ষ কোনো সার্ভিস বইয়ের ব্যবস্থা করেনি বা তা অনুসরণ করে না। আর ২২.৮% উত্তরদাতা সার্ভিস বই কি সে বিষয়ে কিছুই জানে না। দলীয় আলোচনা ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যেও দেখা গেছে মাত্র দুটি বাগানে সার্ভিস বই সংরক্ষণ করা হয়। অন্য কোনো বাগানে সার্ভিস বইয়ের কোনো ব্যবস্থা নাই। অনেক দিন ধরে সার্ভিস বই সংরক্ষন না করার এই ধারা চলে আসছে এবং এত শ্রমিকের সার্ভিস বই নিয়মিত হালনাগাদ করাও অনেক বড় রকমের একটা কাজ যার জন্য অন্তত পক্ষে আরো দুজন শ্রমিক নিয়োগ দিতে হবে যা খরচ সাপেক্ষ। এ কারণে বাগান কর্তৃপক্ষের মধ্যে সার্ভিস বই প্রতিপালনে অনীহা রয়েছে।

---

[৪৯] বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত) ২০১৩, ধারা ৫, পৃষ্ঠা ৩১

[৫০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩), ধারা ৬, ৭ ও ৮।

৪.২.৩. খানার অন্যান্য সদস্যদের অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার সময়

জরিপে দেখা গেছে ১৯.৩% উত্তরদাতার খানায় অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছে। এসব অস্থায়ী শ্রমিকরা কমপক্ষে ছয় মাস থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত অস্থায়ী হিসেবে চা বাগানে কর্মরত রয়েছে কিন্তু স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। অস্থায়ী হিসেবে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগ শ্রমিক (৫৮.৪%) ৬ মাস থেকে ৬ বছর ধরে অস্থায়ী হিসেবে কাজ করছে যা মূল বাগানে ৫৯.৭% এবং ফাড়ি বাগানে ৫৬.৩%।[৫১] তবে দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৪৭টি বাগানে সরাসরি স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ প্রদান বন্ধ রয়েছে। এদের মধ্যে ১২টি বাগানে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সরাসরি স্থায়ীকরণ বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া ৯টি বাগানে ১৬ থেকে ২০ বছর, ১১টি বাগানে ১১ থেকে ১৫ বছর, ১১টি বাগানে ৬ থেকে ১০ বছর এবং ৪টি বাগানে ৫ বছরের কম সময় যাবৎ সরাসরি স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

সারণি ৪.২: বাগানের সংখ্যা

স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ না দেওয়ার সময় সীমা	মূল বাগান		ফাড়ি বাগান		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
২০ বছরের বেশি	৬	২১.৪	৬	৩১.৬	১২	২৫.৫
১৬-২০ বছর	৪	১৪.৩	৫	২৬.৩	৯	১৯.২
১১-১৫ বছর	৭	২৫	৪	২১	১১	২৩.৪
৬-১০ বছর	৮	২৮.৬	৩	১৫.৮	১১	২৩.৪
৫ বছরের কম তিন মাসের বেশি	৩	১০.৭	১	৫.৩	৪	৮.৫
মোট	২৮	১০০	১৯	১০০	৪৭	১০০

৪.২.৪. অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী না করার কারণ

যে সকল উত্তরদাতা কারণ বলতে পেরেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ (৭৯.৫%) উত্তরদাতা জানান যে, স্থায়ী করলে সুযোগ-সুবিধা বেশি দিতে হবে বলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিক স্থায়ীকরণ বন্ধ রেখেছে। এক্ষেত্রে মূল বাগানের (৮৫.২%) হার ফাড়ি বাগানের (৭২.০%) চেয়ে বেশি। অন্যান্যদের মধ্যে ৫.১% উত্তরদাতা পঞ্চায়েতের সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকা, ৩.৩% টাকা চেয়েছে দিতে পারেনি, পরিবারের একজন বা দুইজন স্থায়ী শ্রমিক থাকলে আর স্থায়ী করা হয় না এবং অতিরিক্ত শ্রমিক থাকায় স্থায়ী করে না বলে উল্লেখ করে। এছাড়া ৫.৬% অন্যান্য কারণ উল্লেখ করেছে।

সারণি ৪.৩: অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী না করার কারণ

কারণসমূহ	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
স্থায়ী করলে মজুরিসহ বিভিন্ন সুবিধাদি দিতে হবে তাই কর্তৃপক্ষ স্থায়ী করে না	৮৫.২	৭২.০	৭৯.৫
পঞ্চায়েতের সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল না	৪.৯	৫.৪	৫.১
টাকা চেয়েছে দিতে পারেনি	৪.১	২.২	৩.৩
পরিবারে একজন বা দুই জন স্থায়ী শ্রমিক থাকলে আর স্থায়ী শ্রমিক করে না	০.৮	৬.৫	৩.৩
অতিরিক্ত শ্রমিক থাকায় স্থায়ী করে না	০	৭.৫	৩.৩
অন্যান্য (বয়স বেশি বলে ও বিয়ে হলে চলে যায় তাই বিয়ের আগে স্থায়ী করে না)	৪.৯	৬.৫	৫.৬

৪.৩. মজুরি

৪.৩.১. চা শ্রমিকদের মজুরি

চা বাগান শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি প্রতারণা বা বঞ্চনার শিকার হয় তাদের মজুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে। বেশিরভাগ বাগানে সাধারণত প্রতি সপ্তাহ শেষে শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সর্বশেষ সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে বাগানের শ্রমিকরা সর্বোচ্চ ১০২ টাকা করে দৈনিক মজুরি পাচ্ছে। এর বাইরে বিশেষ কিছু কাজে, যেমন ওষুধ ছিটানো, কারখানার কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী দৈনিক মজুরির পাশাপাশি ৩ থেকে ৫ টাকা ঝুঁকি ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়া যারা পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত তারা

[৫১] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ৭

দৈনিক ১৬ থেকে ২৩ কেজি পর্যন্ত[৫২] পাতা তোলার পর অতিরিক্ত পাতা তোলার জন্য কেজি প্রতি ২ থেকে ৩.৭০ টাকা অতিরিক্ত পেয়ে থাকে। এছাড়াও চা বাগানের শ্রমিকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা যেমন - চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, রেশন, জমি লীজ ইত্যাদি দেওয়া হয়। এসব সুযোগ সুবিধার অর্থ মূল্য হিসাব করলে দেখা যায় চা বাগানের সাধারণ স্থায়ী শ্রমিক যারা রেশন পান তারা সর্বোচ্চ দৈনিক ১৬৯.৩৭ টাকা এবং যারা রেশনের পরিবর্তে ধানের জমি চাষ করেন তারা সর্বোচ্চ ১৪৬.৪৮ টাকা, কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ১৭২.৩৭ টাকা এবং স্প্রে কাজে কর্মরত শ্রমিক দৈনিক ১৭৪.৩৭ টাকা মজুরি পায় যা দেশের অন্যান্য পেশা ও বাজার দরের তুলনায় অনেক কম।

সারণি ৪.৪: চা শ্রমিকদের মজুরি

ক্রমিক নং	বিবরণ	হিসাব	শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি (টাকা)
১	মজুরি	১০২ টাকা প্রতিদিন	১০২.০
২	ভবিষ্য তহবিল	১০২ X ৭.৫% X ১০% (প্রশাসনিক ব্যায়)	৮.৪২
৩	রেশন (আটা/চাল)	১.৫২ কেজি X (১৬.৪ টাকা - ২.০ টাকা) X ৫% (বহন ব্যয়)	২২.৯৯
	ভূমি উন্নয়ন কর	রেশনের পরিবর্তে যারা ধানের জমি ভোগ করে	০.১০
৪	উৎসব ভাতা	৪৫৯০ টাকা /৩৬৫ দিন	১২.৫
৫	শিক্ষা ব্যয়	৬৯২৪০৬৪ টাকা/১৮৪৩২ জন শ্রমিক/৩৬৫ দিন (৩৯টি বাগানের তথ্য)	.৬৬
৭	চিকিৎসা ব্যয়	৫৬১১০৬৮৭.০ টাকা/২৭০৯৯ জন শ্রমিক/৩৬৫ দিন (৩৫টি বাগানের তথ্য)	৫.৭
৮	শ্রমিক কল্যাণ	২৩৯৮১৪৭ টাকা/ ১৫৯৫৬ জন শ্রমিক/ ৩৬৫ দিন (৩৫টি বাগানের তথ্য)	০.৪
৯	দৈনিক বাড়ি ভাড়া	মাসিক ৫০০ টাকা (বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে প্রতি ঘরের জন্য /৩০ দিন)	১৬.৭
	সাধারণ শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি		১৬৯.৩৭
	সাধারণ শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি(যারা রেশনের পরিবর্তে ধানের জমি ভোগ করে)		১৪৬.৪৮
	ফ্যাক্টরি শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি (৩ টাকা ঝুঁকি ভাতাসহ)		১৭২.৩৭
	স্প্রে কাজে কর্মরত শ্রমিক প্রতি দৈনিক মজুরি (৫ টাকা ঝুঁকি ভাতাসহ)		১৭৪.৩৭

সারণি ৪.৪ এ চা বাগানের শ্রমিকের মজুরির একটি হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত হিসাবে শ্রমিকদের দৈনিক ১০২ টাকা হিসেবে মজুরি ধরা হয়েছে। এছাড়া ভবিষ্য তহবিল, রেশন, যারা রেশন পায় না তাদের জন্য ভূমি উন্নয়ন কর, উৎসব ভাতা, শিক্ষা ব্যয়[৫৩], চিকিৎসা ব্যয়[৫৪], শ্রমিক কল্যাণ ব্যয়[৫৫], বাড়ি ভাড়া[৫৬] ও ফ্যাক্টরি ভাতা (যারা ফ্যাক্টরিতে কর্মরত), স্প্রে ভাতা (যারা স্প্রে কাজে নিয়োজিত তাদের জন্য প্রযোজ্য) ইত্যাদি বিষয়গুলোর আর্থিক মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এসব খাত ছাড়াও বাগানের কর্তৃপক্ষ থেকে প্রতি বছর বাড়ি মেরামত, নলকূপ স্থাপন, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থেকে শ্রমিকদের মুক্ত রাখার জন্য স্প্রে করা, ছুপি[৫৭] বরাদ্দ দেওয়া নিয়ম রয়েছে। কিছু কিছু বাগান এ খাতে অর্থ ব্যয় করলেও বেশির ভাগ বাগানেই তা করা হয় না। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে বছরে বাগান প্রতি সর্বোচ্চ ১০ থেকে ২৫টি বাড়ির মেরামত করানো হয়। গবেষণায় দেখা গেছে ৪০টি অর্থাৎ ৬২.৫% বাগানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কোনো স্কুল নেই, অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বাগানগুলোর কোনো ব্যয় নেই। ৬১.২% শ্রমিকের নলকূপ বাবদ ও ৮২.২% শ্রমিকের শৌচাগার বাবদ কর্তৃপক্ষকে কোনো ব্যয় করতে হয়নি বলে জরিপে তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং এ খাত গুলোতে তাদের কোনো অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়নি। তবে উল্লিখিত সুবিধা ছাড়াও শ্রমিকদের কিছু সুবিধা দেওয়া

[৫২] চা পাতা উত্তোলনের বিশেষ সময়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৬ কেজি থেকে ২৩ কেজি পর্যন্ত পাতা উত্তোলন করলে সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী তাকে এক নিরিখ বা এক দিনের মজুরি ১০২ টাকা দেওয়া হয়।

[৫৩] ৩৯টি বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বাবদ মোট ব্যয়ের সাথে মোট শ্রমিক দ্বারা ভাগ করে হিসাব করা হয়েছে

[৫৪] ৩৫টি বাগান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে চিকিৎসা বাবদ মোট ব্যয়ের সাথে মোট শ্রমিক দ্বারা ভাগ করে হিসাব করা হয়েছে

[৫৫] ৩৫টি বাগান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে শ্রমিক কল্যাণ বাবদ মোট ব্যয়ের সাথে মোট শ্রমিক দ্বারা ভাগ করে হিসাব করা হয়েছে

[৫৬] বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে মাসিক ৫০০ টাকা হিসেবে ধরে প্রাক্কলন করা হয়েছে

[৫৭] বাগানে কাজ করার সময়ে শরীরে রোদ না লাগার জন্য মাথায় পরা হয় এমন বাঁশের তৈরি টুপি

হয় যা মজুরি হিসেবে দেখানো সম্ভব হয়নি। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে অবসর প্রাপ্ত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক হিসেবে অবসর ভাতা, বসতবাড়িতে ফলমূল উৎপাদন, গরু-ছাগলসহ গবাদি পশু পাখি পালন ইত্যাদি সুযোগও রয়েছে যা আর্থিক মূল্য যোগ করা যায়নি।

৪.৩.২. বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের মজুরির তুলনা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, চা বাগানের শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয় তা দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকের তুলনায় কম (সারণি ৪.৫)। বাংলাদেশের ওয়েজ বোর্ডের ঘোষিত সর্বনিম্ন মজুরির সাথে এ শ্রেণির চা বাগানের শ্রমিকের মাসিক বেতন তুলনা করলে দেখা যায় যেখানে চা শ্রমিক পায় সর্বোচ্চ ৫২৩১ টাকা সেখানে জাহাজ ভাঙ্গা কারখানার শ্রমিকরা পায় ১৬০০০ টাকা, ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিজ শ্রমিক পায় ১২৮০০ টাকা, এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল ইন্ডাস্ট্রিজ শ্রমিক পায় ৮৭০০ টাকা, ফার্মাসিউটিক্যালস শ্রমিক পায় ৮০৫০ টাকা, তৈরি পোশাক শ্রমিক পায় ৮০০০ টাকা, টি প্যাকেটিং শ্রমিক পায় ৭০৮০ টাকা, স' মিলের শ্রমিক পায় ৬৮৫০ টাকা।

সারণি ৪.৫: বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের মজুরির তুলনামূলক চিত্র[৫৮]

শ্রমিকের ধরন	সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি (টাকা)
জাহাজ ভাঙ্গা কারখানা	১৬০০০ (২০১৮)
ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিজ	১২৮০০ (২০১৮)
এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল	৮৭০০ (২০১৮)
ফার্মাসিউটিক্যালস	৮০৫০ (২০১৭)
তৈরি পোশাক	৮০০০ (২০১৮)
টি প্যাকেটিং	৭০৮০ (২০১৭)
'স' মিলস	৬৮৫০ (২০১৪)
বেকারি বিস্কিট কনফেকশনারি	৫৯৪০ (২০১৮)
অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	৫৯৩০ (২০১৮)
কটন ইন্ডাস্ট্রিজ	৫৭১০ (২০১৮)
চা বাগান শ্রমিক	*সর্বোচ্চ ৫২৩১ (২০১৮ প্রাক্কলিত)

*বর্তমানে প্রাপ্ত মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মূল্যমান হিসেবে

৪.৩.৩. অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি

চা বাগানের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা কম হওয়া ছাড়াও তাদের বঞ্চিত হওয়ার আরেকটি ধরন হচ্ছে ছুটির দিনে মজুরি না দেওয়া ও অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকের সমান মজুরি না দেওয়া। ২০১৩ সালের সংশোধিত শ্রম আইনে সকল শ্রমিকদের ছুটির দিনের মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক করা হলেও কোনো কোনো চা বাগানের শ্রমিকরা এখনও এই সুবিধা পাচ্ছে না।

সারণি ৪.৬: অস্থায়ী শ্রমিকদের কম মজুরি প্রদানকারী বাগানের সংখ্যা ও মজুরির পরিমাণ

প্রদানকৃত মজুরির পরিমাণ	বাগানের সংখ্যা ও শতকরা হার					
	মূল বাগান		ফাঁড়ি বাগান		সার্বিক	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
৫০-৫৯টাকা	১	৫.৯	১	৯.১	২	৭.১
৬০-৬৯টাকা	৪	২৩.৫	৭	৬৩.৬	১১	৩৯.৩
৭০-৭৫ টাকা	১২	৭০.৬	৩	২৭.৩	১৫	৫৩.৬

আবার সমঝোতা স্মারকেও অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকদের সমান হিসেবে মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও কোনো কোনো বাগানে তা এখনও দেওয়া হচ্ছে না। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ২৮টি বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের একই হারে মজুরি দেওয়া হয় না যার হার মূল বাগান (৬৮.৩%) থেকে ফাড়ি বাগানে বেশি (৮২.৬%)। তিনটি বাগানে নথিপত্রে কোনো অস্থায়ী শ্রমিক নাই বা কোনো অস্থায়ী শ্রমিককে কাজ করানো হয় না বলে তথ্য পাওয়া গেছে। যেসব বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকের চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয় যার মধ্যে ২টি বাগানে ৫০ টাকা থেকে ৫৯ টাকা, ১১টি বাগানে ৬০ থেকে ৬৯ টাকা ও ১৫টি বাগানে ৭০ থেকে ৭৫ টাকা করে হাজিরা হিসেবে মজুরি দেওয়া হয়।

[৫৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন http://mwb.portal.gov.bd/site/page/a79b5bb8-d9d1-49fe-9aa6-f4dfdee8f61e/সেক্টর-ভিত্তিক-নিম্নতম-মজুরি-

অর্থাৎ যেসব বাগানে অস্থায়ী হিসেবে মজুরি কম দেওয়া হয় সেসব বাগানে সর্বনিম্ন ১০ টাকা থেকে ৩৫ টাকা পর্যন্ত কম মজুরি দেওয়া হয়। অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার পরিমাণ মূল বাগান থেকে ফাড়ি বাগানে বেশি। বেশির ভাগ (৭০.৬%) মূল বাগানে যেখানে ৭০ থেকে ৭৫ টাকা হাজিরা দেওয়া হয় সেখানে বেশির ভাগ ফাড়ি বাগানে (৬৩.৬%) দেওয়া হচ্ছে ৬০-৬৯ টাকা।

৪.৩.৪. অতিরিক্ত পাতা উত্তোলন বা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার মজুরি

বাগানে যখন অতিরিক্ত পাতা বড় হয়ে যায় এবং দ্রুত পাতা উত্তোলনের প্রয়োজন হয়, তখন কখনও কখনও ছুটির দিন, সকাল বা বিকেলে পাতা উত্তোলন বা ক্যাশ প্লাকিংয়ের প্রয়োজন হয়। এই ক্যাশ প্লাকিং তথা অতিরিক্ত পাতা তোলা বা অতিরিক্ত কর্মঘন্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ মজুরি দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো বাগানেই তা দেওয়া হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে এই ক্যাশ প্লাকিংয়ের জন্য কেজি প্রতি ২ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬ টাকা দেওয়া হয় যা ৭.৪০ টাকা করে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে[৫৯]। একইভাবে নিরিখের অতিরিক্ত পাতা উত্তোলনের জন্যও বেশিরভাগ বাগানে দ্বিগুণ হারে মজুরি দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে কেজি প্রতি সর্বোচ্চ ৩.৭ টাকা অর্থাৎ নিরিখের সমান হারে বা তার থেকে কম (সর্বনিম্ন ২ টাকা) হারে মজুরি দেওয়া হয়।

৪.৩.৫. বাঙ্গালী শ্রমিকদের বেশি মজুরি প্রদান

চা শ্রমিকদের বঞ্চিত করার আরেকটি ধরন হচ্ছে বাঙ্গালী বা স্থানীয় চা শ্রমিকদের তুলনায় প্রথাগত চা শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়া। গবেষণায় দেখা গেছে, পাতা উত্তোলনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে (peak hour) ৩২টি বাগানে সাধারণ বাঙ্গালী বা স্থানীয় চা শ্রমিক (প্রথাগত চা শ্রমিক নয়) অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে ১৬টি বাগানে তাদের বেশি মজুরি এবং ২টি বাগানে কম মজুরি দেওয়া হয়। এ সব স্থানীয় শ্রমিকদের সর্বোচ্চ ৩৩০ টাকা পর্যন্ত দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে ৯৪.৮% উত্তরদাতা জানান যে তাদের মজুরি দিতে কখনই দেরি করে না। যাদের মজুরি দিতে মাঝে মাঝে বা প্রায়ই দেরি করে, তারা জানান কর্তৃপক্ষ ব্যাংকে টাকা পাঠাতে দেরি করলে, চালান জনিত সমস্যা হলে তাদের মজুরি দিতে দেরি হয়।

৪.৪. পাতার ওজনকরণ ও কর্মঘণ্টা

৪.৪.১. পাতার ওজনকরণ

বেশিরভাগ বাগানে প্রতিদিন দুই বার পাতার ওজন করা হয়। দুপুর ১ টায় ও বিকাল ৫ টায়। তবে যেসব বাগানে মর্নিং প্লাকিং (ক্যাশ প্লাকিং) চালু রয়েছে সেখানে দিনে তিন বার পাতার ওজন করা হয়। সকাল ১১ টায়, দুপুর ১ টায় ও বিকাল ৫ টায়। অধিকাংশ (৫৬টি) বাগানে একটা নির্দিষ্ট স্থানে অ্যানালগ কাটার মেশিনে পাতার ওজন করা হয়। মেশিনটির ওজন পরিমাপের নির্দেশক একমুখী হওয়ায় তা শ্রমিকদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না। ওজনকারী বাবু (টিলা বাবু) ওজনের পর যে পরিমাণ উল্লেখ করে, শ্রমিককে সেটাই মেনে নিতে হয়। কোনো শ্রমিক যদি ওজনের পরিমাপ নির্দেশক কাটা দেখার চেষ্টা করে, তবে বাবু তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেয়। আবার কেউ কাটা দেখতে একটু জোর করলে তাকে পরবর্তীতে বিভিন্ন উপায়ে অলিখিত শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেমন তাকে পরের দিন দূরের স্থানে কাজে পাঠানো, নজরদারি বাড়ানো, সামান্য ভুলে বকাঝকা করা ইত্যাদি। ওজনের বিষয় নিয়ে কখনও ম্যানেজার বা অন্য কারো কাছে অভিযোগ করলে কিছুদিন ওজন ঠিক থাকলেও, আবার তা পূর্বের মতোই হয়ে যায়। এছাড়া শ্রমিকদের অধিকাংশই শিক্ষিত না হওয়ায় এসব মাপ বোঝে না। কাটা না দেখে বা লেখাপড়া না জানলেও পাতার ওজন যে কম বলা হয়, সেটা শ্রমিকরা বুঝতে পারে।

গবেষণায় দেখা যায় শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা বহুদিন ধরে পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তারা ১৫ থেকে ২০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। ফলে তাদের পাতার পরিমাণ চোখে দেখেই ওজন অনুমান করার একটা ক্ষমতা তৈরি হয়ে গেছে। তারা যখন পাতা তুলে গামছায় বাঁধে, মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসে, তখন তাদের একটা অনুমান হয় যে এখানে কত কেজি পাতা হতে পারে। এই অনুমানের হেরফের খুব বেশি হয় না। কিন্তু মাপের সময় দেখা যায় বাবুরা অনুমানের চেয়ে অনেক কম বলে। অল্পকিছু কম বললে শ্রমিকরা সেটাকে সঠিক বলে ধরে নেয়। পাতার ওজনের জন্য বেশিরভাগ বাবুরা কাঁচা হিসাব ও পাকা হিসাব নামে দুইটি হিসাব সংরক্ষণ করে। পাকা হিসাবে পাতার প্রকৃত ওজন লেখা থাকে যা তিনি পাতার চালানের সাথে কারখানাতে পাঠায়। এই হিসাব অনুযায়ী সপ্তাহ শেষে তিনি অফিস থেকে টাকা পেয়ে থাকে শ্রমিকদের বেতন দেবার জন্য। অন্যদিকে কাঁচা হিসাবে তিনি পাতার ওজন কম দেখিয়ে যেটা শ্রমিককে জানিয়েছেন, সেটা লেখা থাকে এবং এই হিসাব অনুযায়ী তিনি শ্রমিকদের সপ্তাহ শেষে

[৫৯] ২৩ কেজির দাম ৮৫ টাকা হিসেবে প্রতি কেজির দাম ৩.৭০ টাকা

মজুরি দিয়ে থাকেন। ফলে সপ্তাহ শেষে বেশ বড় অংকের একটা টাকা তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে আয় করেন, যা আসলে শ্রমিকদের পাওয়ার কথা ছিল।

চিত্র ৪.৩: পাতার ওজনের সঠিকতা

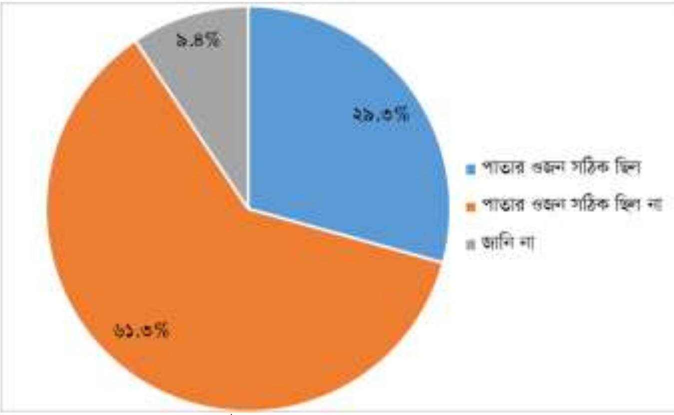

জরিপে দেখা গেছে পাতা তোলার উপযুক্ত সময়ে (পিক সিজনে) পাতা উত্তোলনকারীদের (৫০.২%) মধ্যে ৬০.৩% উত্তরদাতা তাদের পাতার ওজনের সঠিকতা সম্পর্কে তথ্য দিতে পেরেছে। বাকিদের মধ্যে ৩৭.৫% শ্রমিকদের কাছ থেকে অফসিজনে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তখন পাতা বেশি না থাকায় তারা কয়েক কেজি করে পাতা তোলে এবং বাকি সময়টুকু বাগান কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দিয়ে অন্য কাজ করায় এবং ২.২% পাতা সঠিক ছিল কিনা, তা জানে না। যেসকল শ্রমিক পাতার ওজনের সঠিকতা সম্পর্কে তথ্য দিতে পেরেছে, তাদের মধ্যে ৬১.৩% শ্রমিক জানান যে তথ্য সংগ্রহের পূর্বের সপ্তাহে তারা যে পাতা উত্তোলন করেছে সেখানে পাতার ওজন কম ধরা হয়। ৯.৪% শ্রমিক জানে না যে তাদের পাতার ওজন সঠিকভাবে বলা হয়েছে কি না। বিভিন্ন অজুহাতে পাতার ওজন কম দেখানো হয়।

জরিপের তথ্য অনুসারে যেসব শ্রমিক পাতার ওজন কম দেখানো হয় বলে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে ৯২.৬% শ্রমিক জানায় গত সপ্তাহে তাদের ক্ষেত্রে গামছার ওজন বাবদ গড়ে ২.৯ কেজি, ৮.২% শ্রমিকের ক্ষেত্রে পরিবহনের সময়ে পাতা পড়ে যায় এই অজুহাতে গড়ে ২.৪ কেজি, ৭২.৬% ক্ষেত্রে বৃষ্টি হয়েছে তাই পাতার ওজন বেড়ে গেছে এই অজুহাতে গড়ে ৪.১ কেজি এবং ১৮.০% শ্রমিকের ক্ষেত্রে কোনো কারণ ছাড়াই গড়ে ২.০ কেজি পাতার ওজন কম ধরা হয়েছে।

সারণি ৪.৭: পাতার ওজন কম দেখানো বা কেটে রাখার কারণ বা খাতসমূহ

কারণসমূহ	শতকরা	দৈনিক গড়ে
গামছার ওজনের অজুহাতে	৯২.৬	২.৯ কেজি
পরিবহনের সময় পাতা পড়ে যাওয়ার অজুহাতে	৮.২	২.৪ কেজি
বৃষ্টি হলে পাতার ওজন বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে	৭২.৬	৪.১ কেজি
কোনো কারণ ছাড়া	১৮.০	২.০ কেজি

সারণি ৪.৮: দৈনিক কর্তনকৃত পাতার হিসাব

কারণসমূহ	শ্রমিক প্রতি দৈনিক গড়ে	ওজনে কম দিয়েছে বলেছে (%)	শ্রমিক সংখ্যা-জন	প্রতি ক্ষেত্রে দৈনিক মোট কর্তন (কেজি)	টাকার অংকে কর্তন (২৩ কেজিতে হাজিরা এবং দৈনিক ১০২ টাকা মজুরী হিসাবে)
গামছার ওজনের জন্য	২.৯ কেজি	৯২.৬	১৭৩৬১.২৫	৫০৩৪৭.৬২২	২২৩২৮০.৮
পরিবহনের সময় পাতা পড়ে যাওয়া	২.৪ কেজি	৮.২	১৫৩০.৩২	৩৬৭২.৭৭৫	১৬২৮৮.০
বৃষ্টি হলে	৪.১ কেজি	৭২.৬	১৩৬১৪.৬০	৫৫৮১৯.৮৪৬	২৪৭৫৪৮.৯
কোনো কারণ ছাড়া	২.০ কেজি	১৮.০	৩৩৭৭.২৬	৬৭৫৪.৫২৯	২৯৯৫৪.৯
মোট			**৩৫৮৮৩.৪৩**	**১১৬৫৯৪.৭৭১৬**	**৫১৭০৭২.৫**

*২৩ কেজিতে হাজিরা এবং দৈনিক ১০২ টাকা মজুরি হিসাবে[৬০]

[৬০] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ৮

এভাবে পাতা উত্তোলনের উপযুক্ত সময়ে (পিক সিজনে) শ্রমিকদের পাতার ওজন কম দেখিয়ে মজুরি ঠকানো হয় বলে গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রতিদিন সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন অজুহাতে কর্তনকৃত পাতার পরিমাণ বিবেচনায় নিলে দৈনিক **১১৬৫৯৪.৭৭** কেজি পাতা ওজনে কম দেখানো হয় যার মূল্য ৫ লাখ ১৭ হাজার ৭২ টাকা। এই হিসেবে এক সপ্তাহে শ্রমিকদের ৩১ লক্ষ ২ হাজার ৪৩৫ টাকা। তথ্যদাতাদের মতে এই টাকা টিলা বাবু ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহকারী ম্যানেজার, এমন কি শ্রমিক সর্দার ও পঞ্চায়েত সদস্যরাও পেয়ে থাকে। তবে পাতার ওজন কম দেখানোর ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা বেশি বঞ্চিত হয়। নারীদের তুলনায় যেহেতু পুরুষ শ্রমিকরা কিছুটা সচেতন এবং দাবি আদায়ের জন্য বেশি সক্রিয় সেহেতু বাবুরা তাদের পাতার ওজনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সঠিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

৪.৪.২. কর্মঘণ্টা

যেসব শ্রমিক পাতা উত্তোলন ব্যতীত অন্য কাজ করে (৪৯.৮%), যেমন নাইট গার্ড, মালি, ফ্যাক্টরি শ্রমিক, গৃহ পরিচারিকা, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ তথা ৮১.৯% জানান যে তাদের কর্মঘণ্টার হিসাব সঠিক ছিল। মাত্র ৪.০% শ্রমিক জানান যে, সপ্তাহে গড়ে তাদের প্রায় ৯.৪ কর্মঘণ্টা বেশি কাজ করতে হয়েছে, যার কোন ওভারটাইম তাদেরকে দেওয়া হয়নি এবং ৪.১% শ্রমিক বলতে পারে না বা জানে না যে তাদের কর্মঘণ্টা সঠিক ছিল কি না। যেসব শ্রমিক জানান যে তারা দৈনিক আট ঘণ্টার থেকে বেশি কর্মঘণ্টা কাজ করেছেন তারা জানান, দু এক ঘণ্টা ওভার টাইম হিসেবে ধরা হয় না এবং এসব কাজে কোনো ওভারটাইম নাই বা দেওয়ার কোনো নিয়ম নাই। এছাড়া খাওয়ার জন্য যে সময় নষ্ট হয়েছে তা পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে বলে ওভারটাইমের মজুরি দেওয়া হয়নি বলেও শ্রমিকরা উল্লেখ করেছেন।

৪.৫. কাজের পরিবেশ

চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত, যাদের মধ্যে আবার বৃহৎ অংশ নারী শ্রমিক। চা বাগানগুলো কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশাল এলাকায় চলাচলের জন্য যে রাস্তাঘাট রয়েছে তার সিংহভাগই মাটির রাস্তা এবং বিশেষ ধরনের যান ছাড়া এই কাঁচা রাস্তায় চলাফেরা করা কঠিন হয়। আবার বাগানগুলো সংরক্ষিত এলাকায় হওয়ায় এর মধ্যে দিয়ে সচরাচর গণপরিবহনও চলাচল করে না। ফলে অনেক সময় দেখা যায় বাগানের মধ্যে যখন দূরবর্তী এলাকায় শ্রমিকদের কাজ করতে যেতে হয়, তখন তাদের ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে গিয়ে কাজ করতে হয়, যা সময় ও শ্রমসাধ্য। অনেক সময় বাগানের ট্রাক্টরে করে শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট কাজের এলাকাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্গম, পাহাড়ি ও বৃষ্টি ভেজা রাস্তার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। ফলে এই দীর্ঘপথ শ্রমিকদের পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোনো একটা সংযোগ রাস্তা বা কালভার্ট ভেঙ্গে গেছে। তখন পাতা সংগ্রহের গাড়ী সংশ্লিষ্ট কাজের এলাকাতে পৌঁছাতে পারে না। ফলে শ্রমিকদের সংগ্রহকৃত পাতা মাথায় করে নিয়ে কয়েক কিলোমিটার পাড়ি দিতে হয়। বাগানের মধ্যে রাস্তাগুলোর কর্তৃত্ব বাগান কর্তৃপক্ষের বিধায় সরকারি কোনো সংস্থা এসব রাস্তা উন্নয়নের জন্য কাজ করে না। আবার বাগান কর্তৃপক্ষও ব্যয়বহুল হওয়ায় রাস্তাগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেয় না।

৪.৫.১ কাজের জায়গার খাবার পানির ব্যবস্থা

শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৯৬, তফসিল ৫ এর ১ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক চা বাগানের প্রত্যেক কাজের জায়গায় সুবিধাজনক স্থানে সকল শ্রমিকের নাগালের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পানি সরবরাহের নিয়মিত সুব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এ লক্ষ্যে বাগানের প্রতি সেকশনে পাতা ওজনের কেন্দ্রে **১**টি করে নলকূপ স্থাপন বা সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে কাজের স্থানে বা ওজন কেন্দ্রে পানীয় জলের স্থায়ী অর্থাৎ নলকূপ বা কুয়ার কোনো ব্যবস্থা কোনো বাগানেই নেই। ব্রিটিশ আমলে কিছু বাগানে শ্রমিকদের জন্য সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা ছিল যা থেকে কাজের স্থানেও পানির ব্যবস্থা করা হত। বর্তমানে বেশিরভাগ বাগানে (৬১টি) একটি পাত্রে করে পানি বয়ে নিয়ে শ্রমিকদের দেওয়া হয়। তবে ২১টি বাগানে শ্রমিকদের কাজের জায়গায় নলকূপের পানি সরবরাহ করা হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। ২৩টি বাগানে কাজের জায়গায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নাই। এই পানি বাগানের মধ্যে প্রবাহমান ছড়া, ঝরনা, কুয়া, নদী বা খাল থেকে সংগ্রহ করা হয়, যা অপরিষ্কার ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে শ্রমিকরা এই পানি পান না করার চেষ্টা করে। তারা বাসা থেকে যে খাবার পানি বাগানে পান করার জন্য বহন করে সেটা শেষ হয়ে গেলে, অনন্যোপায় হয়েই কেবল ঐ পানি পান করে। পানি সরবারহের কাজ করে এমন শ্রমিকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, শ্রমিকরা যেখানে কাজ করে, বিশুদ্ধ পানির উৎস থেকে তা অনেক দূরে হওয়ায় ঘাড়ে করে অতদূর থেকে পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তারা নিকটস্থ ছড়া বা খাল থেকে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আর ৩টি বাগানে শ্রমিকদের জন্য পানির পাত্র সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার সময় বাসা থেকে পানি নিয়ে যায়।

৪.৫.২ বাগানে (কাজের জায়গায়) টয়লেট বা প্রক্ষালন কক্ষের ব্যাবস্থা

শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৯৬ {তফসিল ৫ এর ২ ধারা (ক) ও (খ)} অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিকের ব্যবহারের জন্য প্রতি সেকশনের পাতা ওজন কেন্দ্রের সুবিধাজনক স্থানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নির্ধারিত মানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃথক পৃথক শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উল্লিখিত প্রতিটি শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে কোনো বাগানেই পাতা তোলা ও ওজন করার স্থানে টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা নেই। নারী শ্রমিকরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাতা তোলার কাজ করে। সাধারণত তাদেরকে সকাল ৯ টা থেকে ১ ঘণ্টা বিরতি দিয়ে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত পাতা তুলতে হয়। এই দীর্ঘ সময় কাজ করতে গেলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার প্রয়োজন হলে তারা বাগানের মধ্যেই কোথাও একটু আড়ালে কাজ সেরে নেয়। এটাই চলে আসছে শত শত বছর ধরে। তাদের মতে 'কর্তৃপক্ষ তো আমাদের বাসা বাড়িতেই কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা করে না, কাজের স্থানে তো ভাবাই যায় না।'

৪.৫.৩ শ্রমিক নিরাপত্তা

বাগানে পাতা সংগ্রহের কাজ করে মূলত নারী শ্রমিকরা। পাতা তোলার ক্ষেত্রে বাগানগুলোকে কয়েকটি সেকশনে (স্থানীয় ভাষায় যাকে নম্বর বলে) ভাগ করা হয়। চা বাগানগুলো বিশাল এলাকা জুড়ে হওয়ায় সীমানা প্রাচীর বা এ জাতীয় মজবুত কোনো বেষ্টনী দ্বারা ঘেরা দেওয়া সম্ভব হয় না। কিছু কিছু স্থানে, বিশেষকরে জনসাধারণের চলাফেরা যে এলাকাতে বেশি, সেখানে তারকাঁটা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। আর বাগানের যে অংশ পাহাড়, জঙ্গল ঘেরা এবং জন-মানবশূন্য সে এলাকাতে কোনোরূপ নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকে না। ফলে শ্রমিকদের নম্বরগুলোতে কিছুটা অরক্ষিত অবস্থার মধ্যেই কাজ করতে হয়। সেখানে নিরাপত্তার জন্য বা কাজ দেখার জন্য একজন সরদার ও তার একজন জোগালী ছাড়া কেউ থাকে না।

> **বক্স ৪.১: একজন নারী শ্রমিকের কথা**
> কতদিন যে জোঁক লেগে রক্ত খেয়ে নিজে থেকেই পরে গেছে তার হিসাব দিতে পারব না। কাজ শেষে বাড়িতে এসে রক্তক্ষরণ দেখে বুঝতে পারি যে আমার শরীরে জোঁক লেগেছিল।

পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য বড় নিরাপত্তার ঝুঁকি হচ্ছে সাপ, জোঁক, বিষাক্ত পোকার আক্রমণ। অধিকাংশ বাগান থেকে এসব প্রতিরোধে কোনো ওষুধ বা এ জাতীয় কিছু দেওয়া হয় না। ফলে শ্রমিকরা যখন পাতা তুলতে যায়, তখন এসবের আক্রমণে পড়তে হয়। যেসব নম্বরে এসব সাপ, জোঁক ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব খুব বেশি, সেসব নম্বরে কাজ করতে যাওয়ার সময় শ্রমিকরা নিজ উদ্যোগে শরীরে কেরোসিন মেখে যায়। বৃষ্টির সময় জোঁকের উপদ্রব মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। তখন কাজ করতে গেলে অনেক সময় জোঁক কানে বা শরীরে পর্যন্ত ঢুকে যায়। বাগান কর্তৃপক্ষকে বার বার বাগানে চুন ছিটানোর জন্য বলা হলেও বেশির ভাগ তারা এ বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করে। শ্রমিকের চোখের মধ্যে জোঁক ঢুকে পড়া, বিষাক্ত পোকা ও সাপের কামড় খাওয়ার ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে। সাপের কামড়ের কারণে অনেকের মৃত্যুও ঘটে থাকে।

৪.৫.৪ কীটনাশক ছিটানোর সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বাগানে যখন কীটনাশক ছিটানো হয় তখন শ্রমিকরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কিছু অতিরিক্ত জিনিসপত্র যেমন - গ্লাভস, মাস্ক, জুতা, এপ্রোন ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে যা কর্তৃপক্ষ পক্ষ থেকে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে[৬১]।

সারণি ৪.৯: কীটনাশক ছিটানোর সময় দ্রব্যাদি দেওয়া না দেওয়ার হার

দ্রব্যাদি দেওয়া না দেওয়ার অবস্থা	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
কিছুই দেয় না	৬০.৪	৪৬	৫৭.০
দুইটি জিনিস সরবরাহ করে	২১.৮	৩৪	২৫.১
চারটি জিনিস সরবরাহ করে	১৭.১	১৪	১৬.৩

[৬১] Memorandum of Labour Agreement, 01.01.2015 to 31.12.2016, point 9 (c) - Supply of plucking Gamcha, hands tools etc.

পাঁচটি পর্যন্ত জিনিস সরবরাহ করে	০.৭	৬	২.১

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে বাগানে থেকে কীটনাশক ছিটানোর সময় নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার কথা থাকলেও, যারা কীটনাশক ছিটায় (১৯.৮%) তাদের মধ্যে ৫৭.০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, কীটনাশক ছিটানোর সময় ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কোনোটিই বাগান কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে না। কীটনাশক ছিটানোর সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের (৫৪.০%) শ্রমিকদের তুলনায় মূল বাগানে (৩৯.৬%) শ্রমিকরা কম পাচ্ছে। খুবই অল্প সংখ্যক (২.১%) শ্রমিক কীটনাশক ছিটানোর সময় ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সবগুলোই পায়। আবার ৩.০% শ্রমিক বাগান থেকে সরঞ্জাম পেলেও তারা তা ব্যবহার করে না।

চিত্র ৪.৪: কীটনাশক ছিটানোর সময় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবহার

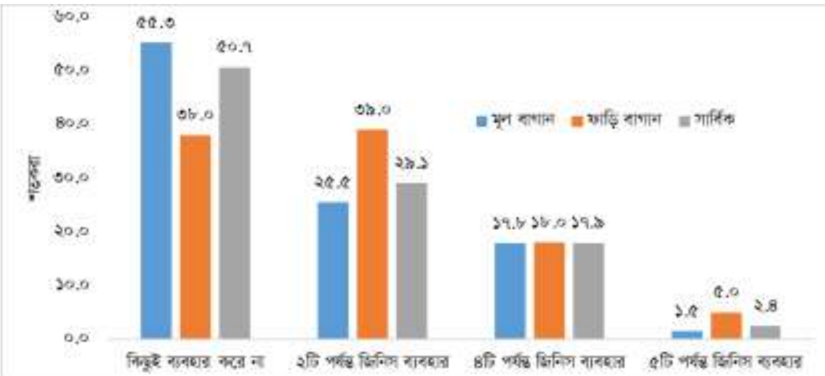

জরিপে দেখা গেছে ৫০.৭% শ্রমিক কীটনাশক ছিটানোর সময় নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির কিছুই ব্যবহার করে না যা মূল বাগানের ক্ষেত্রে ৫৫.৩% এবং ফাড়ি বাগানের ক্ষেত্রে ৩৮.০%। এবং মোটামুটি সবকিছুই ব্যবহার করে এমন শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম (২.৪%)।

৪.৫.৫ কারখানা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

শ্রমিকরা আরেকটি বড় সমস্যা অনুভব করে চা কারখানায় কাজ করার সময়। কারখানা যখন চালু থাকে তখন সেখানে মেশিনে প্রচণ্ড শব্দ হয়। কারখানার শব্দ দূষণ হতে শ্রমিকদের রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা বাগানগুলোতে নেই। ফলে ফ্যাক্টরিতে যেসকল শ্রমিক কাজ করে, তারা প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে কাজ করায় শ্রবণ শক্তিজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে। এছাড়া কাঁচা পাতা কাটার মেশিন, ড্রাইয়ার মেশিন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করার সময়ও শ্রমিক নিরাপত্তায় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না, ফলে শ্রমিকদের ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হয়।

৪.৫.৬ কাজের স্থানে বিশ্রামের ব্যবস্থা

গবেষণায় দেখা গেছে শ্রমিকদের কাজের স্থানে (পাতা তোলার সেকশনে) কোনো বিশ্রামাগার নাই। কিছু নম্বরে টিনের বা ছনের চালার ছাউনি আছে, যেখানে চা পাতা ওজন করা হয়। প্রয়োজনের সময় শ্রমিকরা এখানে বিশ্রাম বা আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ সেকশনে এমন ছাউনিরও কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে বৃষ্টি পড়লে বা অন্য কোনো কারণে বিশ্রামের প্রয়োজন হলে বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হয় না।

৪.৬. ছুটি

৪.৬.১. অসুস্থতাজনিত ছুটি

অধিকাংশ চা বাগানের শ্রমিকরা বছরে ২০ দিন অসুস্থতাজনিত ছুটি পেয়ে থাকে। তবে দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় অনেক বাগানে অসুস্থতাজনিত ছুটি নিতে গেলে বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বরত ব্যক্তির কাছ থেকে অসুস্থতাজনিত প্রতিবেদন নিতে হয়। এই প্রতিবেদন নিতে হলে অসুস্থ শরীর নিয়ে দায়িত্বরত ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়, যা কষ্টসাধ্য ও অমানবিক। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা অসুস্থ না হয়েও অসুস্থতাজনিত ছুটি নিয়ে বাগানের বাইরে অন্যকাজ করে বলে বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে যারা সত্যিকার অর্থে অসুস্থ থাকে তাদের জন্য সমস্যা তৈরি হয়। এছাড়া বাগানের শ্রমিকরা বছরে উৎসব ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মোট ১৪ দিন সবেতন ছুটি ভোগ করে থাকে।

৪.৬.২. মাতৃত্বকালীন ছুটি ও মজুরি

শ্রম আইন অনুযায়ী অধিকাংশ বাগানের নারী শ্রমিকরা ১৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করলেও মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাগানে আইনের ব্যত্যয় হতে দেখা যায়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে জরিপ চলাকালীন সময় থেকে বিগত পাঁচ বছরে ১২.০% খানায় কমপক্ষে একজন স্থায়ী শ্রমিক গর্ভধারণ করেছেন। যারা গর্ভধারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে দুই বা তার কম বার গর্ভধারণ করেছেন ৮১.৪%। ফাঁড়ি বাগানের যারা গর্ভধারণ করেছেন তারা প্রত্যেকেই দুই বা তার কম বার গর্ভধারণ করেছেন যা মূল বাগানে ৮১.৪%। শ্রম আইন অনুসারে কোনো নারী শ্রমিক দুইবার তার সন্তান প্রসব করার জন্য প্রতিবারে মোট ১৬ সপ্তাহ ছুটি পাবেন। তবে কারো দুটি বা তার বেশি সন্তান জীবিত থাকলে সে পরবর্তী বাচ্চার গর্ভধারণের জন্য উক্ত ছুটি ও অন্যান্য সুবিধাদি পাবেন না।[৬২] সুতরাং যেসব শ্রমিক দুই বা তার কম বার গর্ভধারণ করেছেন তারা সবেতনে ১৬ সপ্তাহ ছুটি ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে এসব নারী শ্রমিকদের মধ্যে ৯০.০% মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছিলেন এবং ১০.০% খানার নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পাননি। মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে মূল বাগান (৯২.৯%) থেকে ফাড়ি বাগানের শ্রমিকরা (৮৪.২%) কম ছুটি পাচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়ে বেতন পেয়েছিলেন কি না এ প্রশ্নের জবাবে ১০.০% খানার শ্রমিক বেতন পান নি বলে উত্তর দেন। মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়ে বেতন না পাওয়ার হার মূল বাগানের (৭.২%) তুলনায় ফাড়ি বাগানে (১৫.৮%) বেশি। মাতৃত্বকালীন সময়ে বেতন না পাওয়ার কারণ হিসেবে তখন বাগানে ছুটির প্রচলন না থাকা, গর্ভকালীন অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকা ইত্যাদি উল্লেখ করেন। তবে কিছু শ্রমিক জানে না যে কি কারণে তাদের মাতৃত্বকালীন সময়ে বেতন দেওয়া হয়নি।

শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো নারী শ্রমিক যেদিন থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাবে, তার অব্যবহিত তিন মাসে তিনি যে হারে মজুরি পেয়েছেন ছুটিকালীন সময় তাকে সেই হারেই মজুরি প্রদান করতে হবে।[৬৩] প্রায় সকল নারী শ্রমিক যেহেতু বাগানে পাতা তোলার কাজ করে এবং তারা হাজিরা পাতার অতিরিক্ত প্রতি কেজি পাতার জন্য অতিরিক্ত টাকা পায়, সেহেতু দেখা যায় একজন নারী শ্রমিকের দৈনিক মজুরি নির্দিষ্ট ৮৫ টাকার চেয়ে অনেক বেশি হয়। সেক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকার সময় ঐ নারী শ্রমিকের মজুরি সেই হারেই নির্ধারিত হবার নিয়ম থাকলেও অনেক বাগানে তাদেরকে দৈনিক ৮৫ টাকা হারেই মজুরি দেওয়া হয়। ফলে তারা তাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। আবার কোনো কোনো শ্রমিক তিন মাসের গড় মজুরি হিসাবের এই নিয়ম চলমান থাকায় অনেক শ্রমিক গর্ভাবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে অনেক বেশি কাজ করতে চায়, যা অনেক কষ্টসাধ্য এবং অমানবিক।

৪.৭. উৎসব ভাতা বা বোনাস

বাংলাদেশীয় চা সংসদের সাথে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের দুই বছর পরপর শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে যে চুক্তি[৬৪] করা হয়েছে সে অনুযায়ী চা বাগানের শ্রমিকরা দৈনিক মজুরির ৩২ গুন (সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী ৪৫ গুন) টাকা বছরে বোনাস হিসেবে পাওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই টাকা দুটি উৎসবে ভাগ করে শ্রমিকদের দেওয়া হয়। বেশিরভাগ বাগানে দুর্গা পূজায় বোনাসের ৬০% এবং লাল পূজায় বাকি ৪০% দেওয়া হয়। আবার অনেক বাগানে দুই পূজায় সমান দুইভাগে ভাগ করেও দেয়। বোনাস পাবার ক্ষেত্রে চুক্তিতে উপস্থিতির বিষয়ে যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, তা অনুযায়ী কোনো শ্রমিক বিগত বছরে কমপক্ষে ২৫০ দিন কাজে যোগ দিলেই কেবল ১০০% বোনাস পাবে। তার থেকে কম উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে বোনাস কাটা হয়।

চিত্র ৪.৫: উৎসব ভাতা কম পাওয়ার কারণ

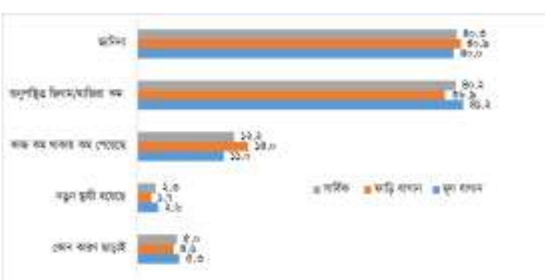

জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় প্রায় ৯৮.৩% শ্রমিক গত বছরে উৎসব ভাতা পেয়েছে। উৎসব ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল বাগান ও ফাড়ি বাগানের হার একইরকম। যারা উৎসব ভাতা পেয়েছে তাদের মধ্যে ৪৪.৯% শ্রমিক বিভিন্ন হারে উৎসব ভাতা কম পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের শ্রমিকরা (৫২.৭%) মূল বাগানের (৪০.৬%) শ্রমিকদের তুলনায় বেশি হারে উৎসব ভাতা কম পাচ্ছে। যারা উৎসব ভাতা কম পেয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ (প্রায় ৪০.৩%) তথ্যদাতা বলতে পারেনি

[৬২] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৬ নং ধারা দেখুন

[৬৩] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ৪৬ ও ৪৫ (৩) (খ) নং ধারা

[৬৪] Memorandum of Labour Agreement, 01.01.2015 to 31.12.2016, point 6: Festival Allowance/ Bonus

কী কারণে তাদের উৎসব ভাতা কম দিয়েছে। আবার বাগানে কাজ কম ছিল, এই অজুহাতে উৎসব ভাতা কম দিয়েছে বলে জানান ১২.২% শ্রমিক, যদিও বাগানে কাজ কম থাকার জন্য শ্রমিকরা দায়ী নয়, এটা সমঝোতা চুক্তিরই লঙ্ঘন। ৫.০% কোনো কারণ ছাড়াই ইচ্ছা করে কম দেয় বলে উল্লেখ করেছেন। তথ্যদাতাদের মতে, তারা ২৫০ দিনের বেশি কাজে উপস্থিত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বাবুরা বলে তারা কম উপস্থিত ছিল। একথা বলে তারা বোনাস থেকে টাকা কেটে রাখে। কোনো কোনো তথ্যদাতার মতে, বাবুরা ঠিকমত হাজিরা তোলে না। দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য মতে, বাগানগুলোতে শ্রমিকদের জন্য কোনো সার্ভিসবুক চালু না থাকায় শ্রমিকরা তাদের কাজের দিনের হিসাব সঠিকভাবে রাখতে পারে না। আবার তাদের হাজিরার হিসাব রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ যে রেজিস্টার ব্যবহার করে তাও শ্রমিকদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না। কর্তৃপক্ষ কোন নথির ভিত্তিতে তাদেরকে কাজের দিনের হিসাব করে উৎসব ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করে, তা অনেক সময় শ্রমিকরা জানে না। ফলে উৎসব ভাতা বিষয়ে শ্রমিকদের অজ্ঞতার কারণে উৎসব ভাতা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। যেসব বাগানে উৎসব ভাতা চালু ছিল না সেসব বাগানে উৎসব ভাতা চালু হওয়ার কারণে শ্রমিকরা অনেক সন্তুষ্ট। একটু কম পেলেও সেটা নিয়ে তারা খুব বেশি চিন্তা করে না। আবার একটু অধিকার সচেতন শ্রমিকরা ভাতা কম পাওয়ার বিষয়ে বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করে।

আবার যে ১.৭% শ্রমিক গত বছর কোনো উৎসব ভাতা পাননি, তাদের বেশির ভাগ নতুন স্থায়ী হয়েছে। আবার অনেকে উৎসব ভাতা না পাওয়ার কোনো কারণ জানে না।

৪.৮. রেশন

চা বাগানে শ্রমিকদের জন্য বছরের পর বছর ধরে রেশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমানে একটি বাগান বাদে সকল বাগানে আটা রেশন হিসেবে দেওয়া হয়। সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী ২ টাকা কেজি দরে স্থায়ী শ্রমিকদের মাথা পিছু প্রতি সপ্তাহে ৩ কেজি ২৭০ গ্রাম এবং তার পরিবারের সর্বোচ্চ তিনজন পোষ্য বাবদ রেশন দেওয়া হয়। এক থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চা পোষ্যদের জন্য এক কেজি থেকে এক কেজি ২২০ গ্রাম এবং ৮ বছরের উর্ধ্বে পোষ্যদের জন্য দুই কেজি থেকে দুই কেজি ৫০০ গ্রাম আটা দেওয়া হয়। তবে পোষ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাগানগুলো কিছু নিয়ম অনুসরণ করে। যেমন - ১২ বছরের উর্ধ্বে কোনো বাচ্চাকে পোষ্য হিসেবে তালিকাভূক্ত না করা, স্ত্রী স্থায়ী শ্রমিক হলে স্বামীকে পোষ্য না করা ইত্যাদি। আবার সপ্তাহে একদিনের বেশি গড় হাজিরা (অননুমোদিত ছুটি) থাকলে রেশন কেটে রাখা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব বাগানে (৬১টি বাগান) স্থায়ী শ্রমিকদের রেশন দেওয়া হয় এবং তাদের পরিবারের পোষ্যরা রেশন পাওয়ার যোগ্য তার মধ্যে ৬টি বাগানে পোষ্যদের রেশন দেওয়া হয় না। স্থায়ী শ্রমিকদের রেশন দেওয়া হলেও অস্থায়ী শ্রমিকদের কোনো রেশন দেওয়া হয় না। তবে কোনো কোনো বাগানের পাতা উত্তোলনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে কিছু অস্থায়ী শ্রমিকদেরও দৈনিক ৫০০ গ্রাম হিসেবে রেশন দেওয়া হয়। যখন তাদের পাতা উত্তোলনের কাজ শেষ হয়ে যায় তারপরে তাদের রেশন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ যেদিনগুলোতে কাজ হয় সেদিনগুলোতেই রেশন পায়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩টি বাগানে কোনো রেশন চালু নেই। এসব বাগানে শতভাগ শ্রমিকদের মাঝে চাষের জমি বরাদ্দ আছে বলে বাগান কর্তৃপক্ষ জানান। জরিপকৃত ৮৫.৮% উত্তরদাতা জানান যে তারা রেশন পান এবং ১৪.২% উত্তরদাতা রেশন পান না। রেশন না পাওয়ার কারণ হিসেবে অধিকাংশ শ্রমিক জানান যে তাদের নামে জমি বরাদ্দ আছে, তাই রেশন দেওয়া হয় না। কিছু ক্ষেত্রে এমন জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা প্রায় সারা বছর পানিতে তলিয়ে থাকে, ফলে চাষাবাদ করা যায় না। রেশন না পাওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে তথ্যদাতারা বাগানে রেশন দেওয়া বন্ধ থাকা, মাসিক শ্রমিকদের রেশন না দেওয়া, বছরে শুধু ১৪ সপ্তাহ রেশন দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখ করেন। কোনো শ্রমিকের নামে কাগজে কলমে চাষের জমি বরাদ্দ রয়েছে কিন্তু বাস্তবে তারা ভোগ করতে পারছে না, তারা বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষকে তা জানালেও এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। আবার অনেকেই জানান যে তাদের যে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা বেশিরভাগ সময়ে পানির নীচে থাকায় তারা ফসল ফলাতে পারে না কিংবা যতটুকু ফসল ফলানো হয় তার দ্বারা খরচ উঠে আসে না। কোনো কোনো বাগানে দেখা গেছে কর্তৃপক্ষ ফসলের জমি ফেরত নিয়েছে কিন্তু তারপরেও তাদের পূর্বের ন্যায় রেশন কেটে রাখছে। বার বার বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের রেশন কাটা বন্ধ করছে না। আবার কোনো কোনো শ্রমিকের বাচ্চা হওয়ার পরে পোষ্য হিসেবে তাদের জন্য রেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে গড়িমসি করে বা অবহেলা করে। এভাবে দেখা যায় কোনো কোনো শ্রমিকের বাচ্চা হওয়ার পরে রেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করতে প্রায় চার বছর পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করে থাকে।

৪.৮.১. রেশন কেটে রাখা

নির্ধারিত রেশন থেকে কোনো কারণে রেশন কেটে রাখে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে ৬৪.২% তথ্যদাতা জানান বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত রেশন থেকে রেশন কেটে রাখে। চাষের জমি বরাদ্দ দিলে তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে রেশন কেটে রাখা হয়, যা বাগানভেদে প্রতি কিয়ার (৩০ শতাংশ) জমির জন্য সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। উত্তরদাতাদের ২৮.৪% চাষের জমি বরাদ্দ

থাকার কারণে রেশন কাটার তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক জমি বর্গা দিতে বাধ্য হয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, আগে তার বাবা স্থায়ী শ্রমিক ছিল এবং সে জমি চাষাবাদ করত। বাবা মারা যাবার পর ছেলে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। সংসারে জমি চাষ করার লোক না থাকায় তারা জমি বর্গা দিতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষি জমি থেকে প্রত্যাশানুযায়ী লাভ হয় না। তথ্যদাতাদের মতে প্রতি কিয়ার জমির বিপরীতে যে পরিমাণ রেশন কেটে রাখা হয় তা অনেক বেশি। কারণ প্রতি কিয়ার (৩০ শতাংশ) জমির জন্য বছরে একজন শ্রমিকের ১৫০ কেজি রেশন কেটে নেওয়া হয়। প্রতি কেজি রেশনের (আটা) সর্বনিম্ন দাম ১৬ টাকা হলে বছরে ২৪০০ টাকা কর্তৃপক্ষ কেটে নেয়। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারকে বছরে ১ কিয়ার জমির জন্য খাজনা দিচ্ছে মাত্র ৯০ টাকা। ২৬.২% তথ্যদাতা জানান, যে সপ্তাহে ২ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলেই নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম রেশন দেওয়া হয়। আবার হাজিরা পাতা কম থাকলে এবং অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটি নিলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ রেশন কেটে রাখা হয় বলে জানান যথাক্রমে ১৯.৭% ও ১৯.২% তথ্যদাতা। এছাড়া কাজ কম থাকলে, কারো মৃত্যু হলে ও ঘরের খাজনা বাবদও রেশন কেটে রাখা হয়।

সারণি ৪.১০: রেশন কেটে রাখার কারণ

কেটে রাখার কারণ	শতকরা
চাষের জমি বরাদ্দ থাকলে	২৮.৪
সপ্তাহে ২ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে	২৬.২
হাজিরা পাতা কম থাকলে	১৯.৭
অসুস্থতা বা অন্য কারণে ছুটি নিলে	১৯.২
ছুটি ছাড়া কাজে না গেলে	৪.৯
কাজ কম থাকলে	০.২
ঘরের খাজনা বাবদ	০.২
অন্যান্য	১.২

৪.৮.২. রেশন ওজনের সঠিকতা

রেশন কেটে রাখা ছাড়াও শ্রমিকদের জন্য আরো বড় একটা সমস্যা রেশন ওজনে কম দেওয়া। প্রাপ্য রেশন থেকে বিভিন্ন কারণে রেশন কেটে রাখার পরও রেশন ওজনে কম দেওয়া হয়। রেশন মেপে দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন রেশন বা গুদাম বাবু। তার কাছ থেকে রেশনের আটা নিয়ে বাসায় এসে মাপলে প্রায়ই দেখা যায় ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম কম হয়। কমের পরিমাণ নির্ভর করে কতটুকু আটা বা চাল রেশন হিসেবে পাচ্ছে তার ওপর। অর্থাৎ রেশনের পরিমাণ বেশি হলে ওজনে অনেক বেশি কম দেয়। কারো নামে ১২ বা ১৩ কেজি রেশন বরাদ্দ থাকলে তাদের রেশন বাড়ি আনার পর ওজন করলে দেখা যায় এক কেজি পর্যন্ত কম হয়। সবচেয়ে বেশি (৪১.৩%) উত্তরদাতা জানান যে তাদের ৫০০ গ্রাম থেকে ৯০০ গ্রাম পর্যন্ত রেশন কম দেওয়া হয়। ৫.৫% উত্তরদাতা জানান তাদের ১৪০০ গ্রামেরও বেশি রেশন কম দেওয়া হয়। ২৫.৬% উত্তরদাতা জানান যে তাদের রেশন কম দেওয়া হয় কিন্তু তারা মেপে দেখেনি যে কতটুকু ওজনে কম দেওয়া হয়।

সারণি ৪.১১: রেশন ওজনে কম হওয়ার পরিমাণ

পরিমাণ	শতকরা
মেপে দেখেনি	২৫.৬
<৫০০ গ্রাম	১৫.৫
৫০০-৯০০ গ্রাম	৪১.৩
১০০০-১৪০০ গ্রাম	১২.১
১৪০০+ গ্রাম	৫.৫

চিত্র ৪.৬: রেশন কম হওয়ার হার

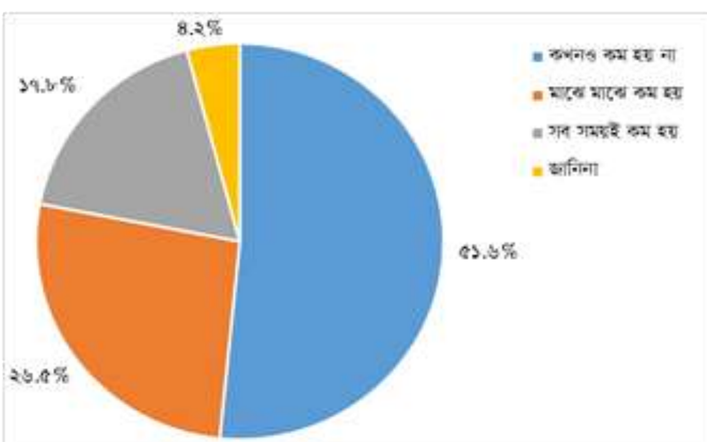

ওজনে কমের বিষয়ে অভিযোগ করলেও কোনো সমাধান হয় না। তাছাড়া অভিযোগ করলে দু' এক সপ্তাহ ঠিকমত ওজন করলেও পরে আবার কম দিতে শুরু করে। রেশন ওজনে কম হওয়ার বিষয়টি এখন সবাই মেনে নিয়েছে। জরিপে দেখা গেছে ২৬.৫% উত্তরদাতা জানান তাদের মাঝে মাঝে রেশন কম দেয় এবং ১৭.৮% জানান তাদের রেশন সব সময়ই কম দেয়। আর যাদের রেশন কম দেওয়া হয় তাদের পরিবার প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৬২৯ গ্রাম রেশন কম দেওয়া হয়।

৪.৮.৩. রেশনের মান

রেশন হিসেবে প্রদেয় আটার মান একেক সময় একেক ধরনের হয়ে থাকে। প্রায় ৫৬.৪% তথ্যদাতা বলেন বর্তমানে বাগানে যে রেশন দিচ্ছে তার মান ভাল আর ১৪.১% এই রেশন খুব ভাল বলে মত দেন। তবে ৬.৫% তথ্যদাতা রেশন খারাপ বা খুব খারাপ বলে মত দেন।

চিত্র ৪.৭:প্রাপ্ত রেশনের মান

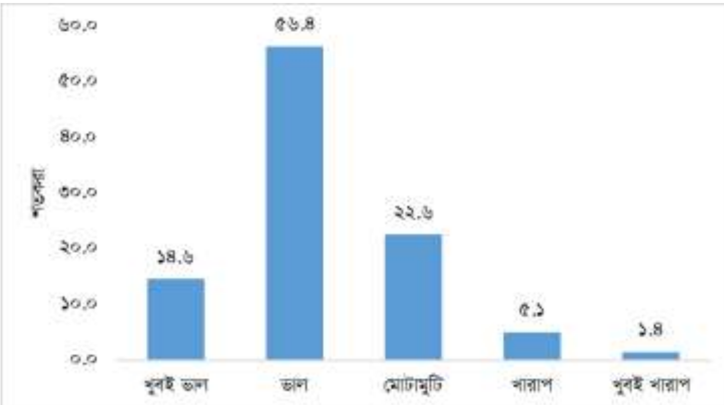

তবে বর্তমানে বেশিরভাগ বাগানে ভালো মানের আটা রেশন হিসেবে দিচ্ছে বলে জানান তথ্যদাতারা। কয়েক বছর আগে এমন কি কোনো কোনো বাগানের ক্ষেত্রে কয়েক মাস আগেও এমন ভালো মানের আটা দেওয়া হত না। এখনও কিছু বাগানে নিম্ন মানের আটা দেওয়া হচ্ছে বলে তথ্যদাতারা জানান। কখনও কখনও আটায় পোকা থাকে। আবার কিছু কিছু সময় আটার রুটি খুব বিস্বাদ হয়ে থাকে। যেসব বাগানে মাঝে মাঝে চাল দেয়, সেই চালের মান ভাল থাকে না। শ্রমিকদেরকে ভারত থেকে আমদানিকৃত মোটা এলসি করা চাল দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

৪.৮.৪. প্রাপ্ত রেশনে প্রয়োজন মেটার অবস্থা

চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলো দুই বেলা রুটি খেয়ে অভ্যস্ত। ফলে রেশন হিসেবে যতটুকু আটা শ্রমিক পরিবারগুলো পায়, তাতে বেশিরভাগ শ্রমিক পরিবারের সপ্তাহ চলে না। সপ্তাহে কয়েক কেজি আটা তাদের বাইরে থেকে কিনতে হয়। এজন্য শ্রমিক পরিবারগুলোর জন্য বাগান থেকে সরবরাহ করা রেশন পর্যাপ্ত নয় বলে তথ্যদাতারা জানান এবং তাদের হার ৬৮.৯%।

চিত্র ৪.৮: প্রাপ্ত রেশনে প্রয়োজন মেটার অবস্থা

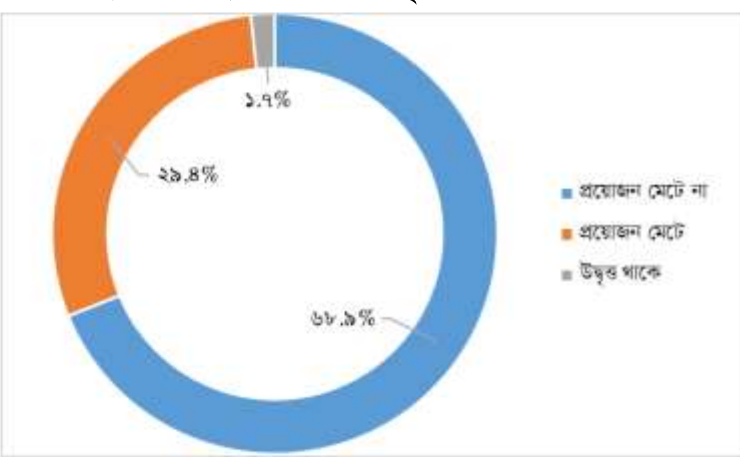

২৯.৪% জানান যে প্রাপ্ত রেশনে তাদের সমান সমান হয়, এবং মাত্র ১.৭% তথ্যদাতা বলেন যে তাদের কিছু রেশন উদ্বৃত্ত থাকে। যেসব পরিবারে সদস্য সংখ্যা কম বা রেশনের জন্য উপযোগী সদস্য সংখ্যা বেশি, এমন পরিবারে সপ্তাহে কিছু আটা উদ্বৃত্ত থাকে, যা তারা অন্য শ্রমিক পরিবারের কাছে ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে দেয়। আবার কেউ অন্য গরিব শ্রমিক পরিবারকে বা নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে বিনামূল্যে দিয়ে দেয়। যে সকল শ্রমিক পরিবার জানান যে, প্রাপ্ত রেশনে তাদের প্রয়োজন মেটে না, তাদের অধিকাংশ (৯৬.০%) বাজার থেকে সপ্তাহে কয়েক কেজি চাল বা আটা কিনে প্রয়োজন মেটালেও অন্তত ৩.১% শ্রমিক জানান যে তারা খেয়ে না খেয়ে জীবন চালায় বা ধার করে অতি কষ্টে প্রয়োজন মেটায়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যেসব শ্রমিক জানান যে প্রাপ্ত রেশন তাদের প্রয়োজন মেটে না, তাদের প্রাপ্ত মোট রেশন এবং পরিবারের ২ বছরের উর্ধে মোট সদস্য সংখ্যা বিবেচনায় নিলে জন প্রতি প্রতিদিন প্রাপ্ত রেশনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০ গ্রাম।

৪.৯. আবাসন

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৯৬ এর তফসিল ৫ ধারা ৭ (ক) অনুসারে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতিটি শ্রমিকের ও তাহার পরিবারের বসবাসের জন্য বিনামূল্যে বাসগৃহের ব্যবস্থা করিবেন। চা বাগান স্থাপনের শুরু থেকে বাগানে কর্মরত সকল স্থায়ী

শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে বাগান কর্তৃপক্ষ, যেটা কর্তৃপক্ষ থেকে শ্রমিকদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম। যেকোনো শ্রমিক পরিবারের বাগানে বাসস্থান প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হল, ঐ পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য বাগানের স্থায়ী শ্রমিক হতে হবে। কিন্তু দেখা যায় কোনো পরিবারে একাধিক স্থায়ী শ্রমিক রয়েছে, কিন্তু ঘরের বরাদ্দ একজনের জন্যই রয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী চা বাগানে মোট ১ লক্ষ ৮৪৩ জন স্থায়ী শ্রমিক রয়েছে যাদের মধ্যে পাকা ঘর দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৬ হাজার পাঁচ শত ৬৫ জন স্থায়ী (১৬.৪%) শ্রমিককে এবং কাঁচা ঘর দেওয়া হয়েছে ৫১ হাজার ৯৭৯ জন (৫১.৫%) স্থায়ী শ্রমিককে। বাকি ৩২ হাজার ২৯৯ জন (৩২.১%) স্থায়ী শ্রমিকরা এখনও আলাদাভাবে কোনো আবাসন সুবিধা পায়নি। এছাড়া অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্যও কোনো আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। অনেক পরিবারেরই সকল সদস্যদের জন্য বাগান কর্তৃক প্রদেয় ঘর যথেষ্ট নয়। বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ঘরে পরিবারের সদস্য ছাড়া গবাদি পশুও থাকতে দেখা যায়।

৪.৯.১. ঘর দেওয়ার অংশীজন

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যেও দেখা গেছে কিছু কিছু শ্রমিক তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জরিপে দেখা গেছে মাত্র ৬৮.২% শ্রমিকের ঘর সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষ তৈরি করে দিয়েছে। মালিকের খরচে ঘর দেওয়ার হার ফাড়ি বাগানের (৫৭.১%) তুলনায় মূল বাগানে (৭৪.৩%) অনেক বেশি। অন্যদিকে ২১.৭% শ্রমিক নিজ খরচে ঘর বানিয়ে নিয়েছে বা এনজিও বা ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েছে কিংবা তাদের কোনো ঘরই নাই। এক্ষেত্রে দেখা গেছে মূল বাগানের (১৭.৩%) তুলনায় ফাড়ি বাগানের (৩০.১%) হার অনেক বেশি।

সারণি ৪.১২: ঘর দেওয়ার অংশীজনের ধরন

ঘর দেওয়ার/ তৈরির অংশীজন	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
মালিকের দেওয়া	৭৪.৩	৫৭.১	৬৮.২
নিজে/ এনজিও/ ইউনিয়ন পরিষদ	১৭.৩	৩০.১	২১.৭
আংশিক নিজের আংশিক মালিকের দেওয়া	৮.৪	১২.৮	১০.১

৪.৯.২. বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদানকৃত ঘরের ধরন

নিয়ম অনুসারে বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের যে ঘর দেবে তা হবে কমপক্ষে ৩২ বর্গমিটার পোতা (মেঝে) মাপের জায়গায় 'মির্তিঙ্গা টাইপ' বিশিষ্ট ঘরের ডিজাইন।[৬৫] অর্থাৎ মির্তিঙ্গা বাগানে যে ধরনের বাড়ি রয়েছে সে ধরনের বাড়িই কর্তৃপক্ষদের পক্ষ থেকে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। মির্তিঙ্গা বাগানে সাধারণত মেঝে ও দেয়াল পাকা টিনের চাল বা, মেঝে ও দেয়াল কাঁচা টিনের চাল বিশিষ্ট ঘরই বেশি দেখা যায়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি (৬৪.০%) শ্রমিকের বাড়ি মাটির দেয়াল ও টিনের চাল দ্বারা তৈরি। এ ধরনের বাড়ির হার ফাড়ি বাগানে (৭২.৯%) মূল বাগান (৬০.২%) থেকে বেশি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকা দেয়াল ও টিনের চাল বিশিষ্ট ঘর যার হার হচ্ছে ২১.৩%। পাকা দেওয়াল ও টিনের চালের বাড়ি মূল বাগানের (২৪.৭%) তুলনায় ফাড়ি বাগানে (১৩.৩%) কম। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে মাটির দেওয়াল, ছনের চাল ৮.০%, বাঁশের দেওয়াল ছনের চাল ২.৫%, বাঁশের দেয়াল টিনের চাল ২.৪%, টিনের দেওয়াল টিনের চাল ১.৬% ও অন্যান্য ও পাকা বাড়ি ০.৪%।

সারণি ৪.১৩: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত ঘরের ধরন

ঘরের ধরন	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
মাটির দেয়াল, টিনের চাল	৬০.২	৭২.৯	৬৪.০
পাকা দেয়াল, টিনের চাল	২৪.৭	১৩.৩	২১.৩
মাটির দেয়াল, ছনের চাল	৮.০	৭.৮	৮.০
বাঁশের দেয়াল, ছনের চাল	২.৩	২.৯	২.৫
বাঁশের দেয়াল, টিনের চাল	৩.০	০.৮	২.৪
টিনের দেয়াল, টিনের চাল	১.৫	১.৮	১.৬
অন্যান্য (পাকা বাসা)	০.২	০.৫	০.৪

৪.৯.৩. বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদানকৃত ঘরের সমস্যা

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ৯০.৬% আবাসনে একটি মাত্র ঘর করে দেওয়া হয়েছে যার মাঝ বরাবর কোনো বেড়া নেই। যেসব শ্রমিকের আবাসনে একাধিক ঘর রয়েছে, সেই অতিরিক্ত ঘরগুলো তারা নিজের খরচে তৈরি করেছে অথবা বিভিন্ন এনজিও তৈরি করে দিয়েছে। যেসব খানায় একটিমাত্র কক্ষ রয়েছে সেসব খানার অধিকাংশ (৬২.৩%) ঘরে ৪ থেকে ৬ জন মানুষ বসবাস করে। আর ১ থেকে ৩ জন মানুষ বসবাস করে এমন খানার হার ২৯.২%। ৬ জনেরও বেশি লোক বাস করে ৮.৪% ঘরে। ফলে অনেক পরিবারকে মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ছেলের বৌকে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যেই বসবাস করতে হয়। যারা একটু সামর্থ্যবান

[৬৫] বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৯৬ এর তফসিল ৫ ধারা ৭ (ছ)(অ)

তারা নিজেদের খরচে একাধিক ঘর তুলে নেয় নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে। অনেক সামর্থ্যবান শ্রমিক পরিবার পাকা বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে। তবে যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাদেরকে বহু কষ্টে ঘিঞ্জি পরিবেশে থাকতে হয়।

চিত্র ৪.৯: একটি ঘর বিশিষ্ট আবাসনে বসবাসকারী পরিবারের সদস্য সংখ্যা

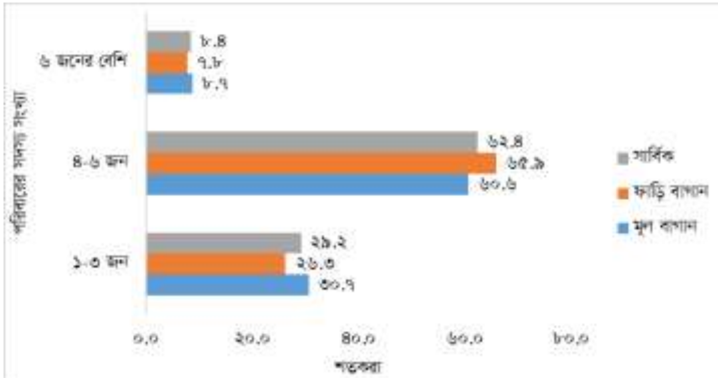

বেশির ভাগ বাগানে যে নতুন ঘর দেওয়া হচ্ছে তাতে বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে একজন স্থায়ী শ্রমিকের জন্য ১৪ হাত x ১১ হাত একটা ঘরের চালের জন্য শুধু টিন আর কাঠ দেওয়া হয়। কোনো বেড়ার ব্যবস্থা বাগান থেকে করা হয় না বলে দলীয় আলোচনায় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রমিকরা নিজেরা মাটি কেটে দেয়াল তৈরি করে নেয়। দরজা-জানালা তৈরি করার জন্য বাগান থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করা হয় না। কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে সম্পাদিত সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী মাটির দেয়াল তৈরির জন্য শ্রমিকদের পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ শ্রমিকই তা পায়নি বলে দলীয় আলোচনায় তথ্য পাওয়া যায়। বাগানে আবাসনের ক্ষেত্রে আরো একটি বড় সমস্যা হল, বাগান থেকে মাত্র একজন স্থায়ী শ্রমিক পরিবারে জন্য যে ঘর দেওয়া হয়। তবে দু' একটি বাগানে বর্তমানে নতুন করে শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক কোয়াটার এর আদলে পানি, শৌচাগার ও বিদ্যুৎ সুবিধাসহ ঘর তৈরি করছে, যেখানে প্রতি পরিবারের জন্য দুটি কক্ষ, রান্নাঘর ও একটি বারান্দাসমৃদ্ধ আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এর সংখ্যা খুবই সামান্য।

৪.৯.৪. আবাসন মেরামত ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসারে চা বাগানের কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে বাসগৃহ উপযুক্ত এবং নিরাপদ রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে গৃহসমূহের প্রয়োজনীয় মেরামত এবং সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।[৬৬] জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৭০.৯% শ্রমিকের ঘর বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেরামত করে দেওয়া হয়। ঘর মেরামত করার ক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষ মূল বাগানের বেশি ভূমিকা রাখে বলে জরিপে তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে ২২.৮% শ্রমিকের ঘর শ্রমিকরা নিজেই মেরামত করে নেয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় অধিকাংশ বাগানের ঘরগুলোর একটি বড় অংশ অনেক দিন আগে তৈরি করার কারণে এখন নড়বড়ে হয়ে পরেছে। বেশির ভাগ বাগানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘর মেরামত করানোর জন্য দুই থেকে তিন মাস এমনকি এক বছরও অফিসে গিয়ে সময়ক্ষেপণ করতে হয়। তাও আবার দেখা যায় যে একটি বাগানে ১০০ পরিবারের ঘর মেরামতের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ঐ বছর বাগান কর্তৃপক্ষ ২০ থেকে ২৫টি ঘর মেরামতের জন্য বাজেট বরাদ্দ রেখেছে।

বক্স ৪.২: ফাড়ি বাগানে একজন পুরুষ শ্রমিকের ভাষ্য

বছর পার হয়ে গেল টিনে ফুটো হইছে, বৃষ্টিতে দেয়াল ভিজে ফাটল দেখা গেছে, পঞ্চায়েতকে বললাম, ছোট সাহেবকে বললাম, বড় সাহেবকে বললাম কোনো কিছু আমলে নেয় নি। দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে মারা গেলে তারপর সাহেবরা এসে ঘর মেরামত করে দেবে তার আগে আর ঠিক হবে না। রাস্তায় কেউ মারা গেলে যেমন স্পিড ব্রেকার দেয় তেমনি দেয়াল ভেঙ্গে শ্রমিক মারা গেলে তার পর সাহেবেরা এসে ঘর ঠিক করে দেয়

চিত্র ৪.১০: আবাসন মেরামতের অংশীজনের ধরন

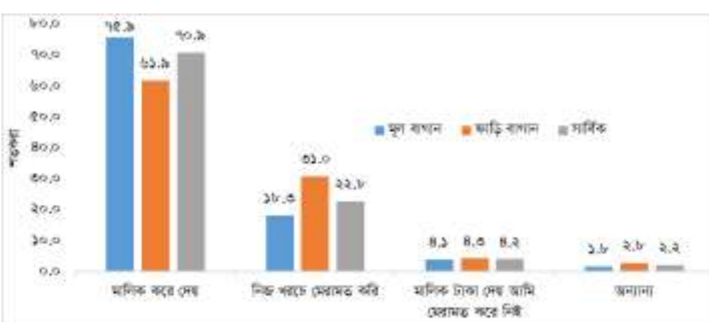

তখন ঐ একশ পরিবারের মধ্যে থেকে যাদের ঘরের অবস্থা খুবই খারাপ, এমন ১০ থেকে ২৫টি ঘর মেরামতের ব্যবস্থা করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সারা বছর ধরেই মেরামতের কাজ চলতে থাকে। অনেক পরিবারকে ঘর মেরামতের জন্য বছরের পর বছর বৃষ্টিতে ভিজে অপেক্ষা করতে হয়। ফলে এমন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা না করে যেসব পরিবারের একটু সামর্থ্য থাকে, তারা বাগান কর্তৃপক্ষের জন্য অপেক্ষা না করে

[৬৬] বালাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, বিধি ৯৬, তফসিল ৫, ধারা ৭ এর (৩) (ক)

নিজেরাই ঘর মেরামত করে নেয়।

৪.৯.৫. আবাস স্থলে আলোর ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ উল্লেখ রয়েছে যে, যে এলাকায় আবাসিক গৃহসমূহ নির্মিত হয়েছে সেইখানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিবেন।[৬৭] কিন্তু জরিপে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৪৮.৪% উত্তরদাতার ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা রয়েছে। ২৭.৯% শ্রমিক এখনও কেরোসিন তেল ব্যবহার করে রাতের বেলায় আলো জ্বালায়। অন্যান্যদের মধ্যে ২৩.৪% শ্রমিক তাদের ঘরে সোলারের মাধ্যমে আলো জ্বালায়। পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, যেসব বাগানে শ্রমিকদের আবাসনে বাগান কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, সেসব বাগানে বিদ্যুৎ বিল শ্রমিকরাই দিয়ে থাকে। বাগানে কোনো শ্রমিক নিজ নামে মিটার আনতে পারে না। মিটার আসে বাগানের নামে। এই একটি মিটার থেকে শ্রমিকদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে মিটারের বিল আসে শুধুমাত্র মূল মিটার, অর্থাৎ বাগানের নামে।

চিত্র ৪.১১: শ্রমিকদের আবাসনে আলোর ব্যবস্থা

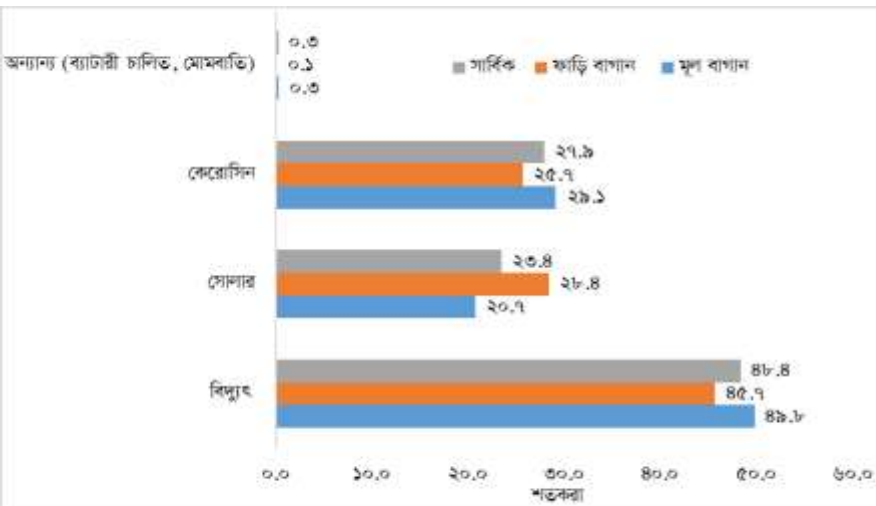

বাগান কর্তৃপক্ষ একজন কর্মচারীকে মিটারের বিল শ্রমিকদের কাছ থেকে আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে দেয়। এই ব্যক্তির দায়িত্ব থাকে যেসব শ্রমিকদের বাসায় সাব মিটার রয়েছে সেসব শ্রমিকদের মূল মিটারের ইউনিট প্রতি দাম ধার্য করে শ্রমিকের সাব মিটারের রিডিং দেখে তার কাছ থেকে সেই পরিমাণ অর্থ আদায় করার। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রমিকরা বেশ কিছু অনিয়মের শিকার হন। অনিয়মগুলোর মধ্যে রয়েছে, মূল মিটারের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের যে দাম আসে, শ্রমিকদের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশি অর্থ আদায় করা, সাব-মিটারে রিডিং যাই আসুক, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা শ্রমিকদের থেকে আদায় করা ও মূল মিটারের বিল দেখতে চাইলেও না দেখানো।

দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, অনেক বাগানে আবার শ্রমিকদের জন্য সাব-মিটারের কোনো ব্যবস্থা নেই। কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছামতো একটি বিল শ্রমিকদের হাতে লিখে ধরিয়ে দেয়। সাধারণত বাতি জ্বালিয়ে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা বিল দিতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা ৭০০ থেকে ৮০০ টাকাও হয়ে থাকে। বাগান কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না। শ্রমিকরা আলাদা মিটার আনতে চাইলেও নিয়মের কারণে সেটা সম্ভব হয় না। ফলে তাদের যে বিল দেয়, সেটা মেনে নিতে হয়। আবার কিছু বাগানে দেখা গেছে, শ্রমিকদের ঘরে আলাদা মূল মিটার রয়েছে, যেটা মূলত বাগানের নামে। এই মিটারের জন্য আলাদা বিল আসলেও সেটা আসে বাগানে। বাগান থেকে ওই শ্রমিককে মূল বিল না দিয়ে, হাতে লিখে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিল ধরিয়ে দেওয়া হয়। মূল বিল দেখতে চাইলেও তা দেখানো হয় না। এমন ভুক্তভোগী কয়েকজন বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে অতিরিক্ত বিলের কারণ জানতে চাইলে অফিস থেকে জানানো হয় এ বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। তারা যথাযথ বিলের কাগজ বাগানের অফিসে পৌঁছে দিয়েছে। এত বিল কেন এল তা তারা বলতে পারে না।

অন্যদিকে যেসব শ্রমিক সোলার ব্যবহার করে তাদের বেশির ভাগই সোলার এনজিও কর্তৃক বা নিজেরা ব্যবস্থা করেছে। এক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষ কোনো অবদান রাখে না। আবার যারা কেরোসিন ব্যবহার করে আলো জ্বালায় তাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খরচই শ্রমিকদের করতে হয়, অথচ আলোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বাগান মালিকের।

[৬৭] বালাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, বিধি ৯৬ তফসিল ৫, ধারা ৭এর (৩) (খ)

৪.৯.৬. আবাস স্থলে খাবার পানি সরবরাহ

শ্রমিক পরিবারের আবাসন সুবিধার সাথে সাথে তাদের খাবার পানির ব্যবস্থা করার দায়িত্বও বাগান কর্তৃপক্ষের। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসারে, কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক পানীয় জলের সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে পানীয় জলের জন্য অন্তত পক্ষে ২৫ পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ বা ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়ার ব্যবস্থা রাখবেন। কুয়াতে দুটি হস্তচালিত পাম্প থাকতে হবে এবং উক্ত কুয়াটি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এই কুয়ার পানি ব্যবহারের উপযোগী কিনা সে সম্পর্কে সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষকে লিখিত নির্দেশ দিতে পারবে।[৬৮] জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা (৭২.৫%) নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে। এছাড়া ১৬.১% উত্তরদাতা কুয়ার পানি, ৯.৫% সাপ্লাইয়ের পানি, ২.০% ছড়া, পুকুর ও খাল বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে।

চিত্র ৪.১২: শ্রমিকদের আবাসনে খাবার পানির উৎস

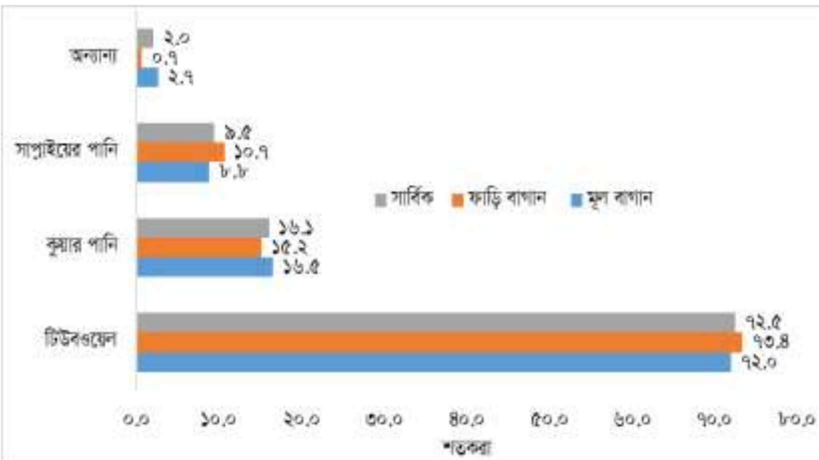

যারা নলকূপ থেকে পানি সরবরাহ করে তাদের মধ্যে মাত্র ৩৯.১% উত্তরদাতা বাগান কর্তৃপক্ষ স্থাপিত নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে। ৩৪.৫% শ্রমিক নিজ খরচেই নলকূপ বসিয়েছেন, ১০.৫% স্থানীয় সরকার, ৪.৭% শ্রমিকের নলকূপ এনজিও এবং ১১.৪% শ্রমিক প্রতিবেশীর নলকূপ বা বাংলাদেশ চা বোর্ডের স্থাপিত নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত নলকূপ থেকে সংগ্রহকৃত পানি পান করে মূল বাগানের ৪৩.৫% শ্রমিক যা ফাড়ি বাগানের চেয়ে (৩০.২%) বেশি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ৫টি বাগানে কোনো নলকূপ নাই। তারা শুধু কুয়া বা মাটিতে গর্ত করে যে পানি পাওয়া যায় সে পানির উপরে নির্ভরশীল। এখানে বিশুদ্ধ পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। ২৫টি পরিবারের জন্য একটি নলকূপের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও কোনো কোনো বাগানে এই পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি। কর্তৃপক্ষ যেসব নলকূপের ব্যবস্থা করেছে তা পর্যাপ্ত নয়। একটি বাগানে ১৪৮টি পরিবারের জন্য একটি নলকূপ রয়েছে। অন্য একটি বাগানে ১৬৪টি পরিবারের জন্য একটি নলকূপ রয়েছে যা এনজিও কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। বেশির ভাগ বাগানেরই একই চিত্র লক্ষণীয়। কোনো কোনো বাগানে শ্রমিকদের অনেক দূর থেকে নলকূপের পানি সংগ্রহ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় একটু স্বচ্ছল কোনো শ্রমিক নিজ খরচে নলকূপ স্থাপন করেছে এবং আশে পাশের শ্রমিক পরিবার সেখান থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করছে। দেশের অন্যান্য এলাকায় সরকার থেকে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয় যার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। চা বাগান এলাকায় এই ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয় না। কোনো কোনো বাগানে নলকূপ বাড়িতে না বসিয়ে নিচু অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বসানো হয় যার চারদিকে কোনো পাঁকা স্লাবের ব্যবস্থা করা হয় না। কোনো কোনো বাগানে আবাসনের সাথে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থাই কর্তৃপক্ষ করে দেয়নি। যেসব বাগানে পানির জন্য কিছু কুয়ার ব্যবস্থা আছে সেসব কুয়ার পানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘোলাটে, এগুলোর কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা বা ঢাকনা নেই, কুয়াগুলো এমন নিম্ন জায়গায় অবস্থিত যে তার পানি সুরক্ষা করাও সম্ভব নয়, বৃষ্টি হলেই বিভিন্ন ময়লা কুয়ার পানিতে ঢুকে যায়, কোনো কোনো কুয়ার মধ্যে ব্যাঙসহ বিভিন্ন পোকা-মাকড় বাস করে, সরবরাহের জন্য যেসব পাত্র ব্যবহার করছে তাও অস্বাস্থ্যকর, যেসব স্লাব ব্যবহার করা হয়েছে তা দীর্ঘদিনের পুরানো, ভাঙ্গা ও শ্যাওলা

সারণি ৪.১৪: নলকূপ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ধরন

অংশীজন	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
বাগান কর্তৃপক্ষ	৪৩.৯	৩০.২	৩৯.১
নিজের খরচে বসানো	৩৩.৬	৩৬.১	৩৪.৫
স্থানীয় সরকার কর্তৃক	৯.২	১৩.০	১০.৫
এনজিও কর্তৃক	৪.৩	৫.৫	৪.৭
অন্যান্য	৯.০	১৫.২	১১.২

[৬৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, বিধি ৯৬ তফসিল ৫ ধারা ৭এর (২)

পরা। যেসব বাগানে সাপ্লাইয়ের পানি ব্যবহার করা হয় তার কোনো কোনোটিতে সব সময় পানি সরবরাহ করা হয় না। সকালে এক ঘণ্টা ও বিকেলে এক ঘণ্টা মাত্র পানি দেওয়া হয়। এমনও দেখা গেছে কোনো কোনো বাগানে দিনের পর দিন পানি সরবরাহ থাকে না। ফলে তাদের টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরম সংকটে পরতে হয়। সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে যে পানি সরবরাহ করা হয় তার মানও খারাপ । কোথাও কোথাও নদী বা খালের বা পুকুরের পানি কোনোরকম বিশুদ্ধ না করে সরবরাহ করা হয়।[৬৯]

৪.৯.৭. আবাসনে শৌচাগারের ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর (৫) নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সকল শ্রমিককে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে শ্রমিকদের আবাসন সুবিধার সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখিবেন।[৭০]

চিত্র ৪.১৩: শ্রমিকদের আবাসনে শৌচাগারের ধরন

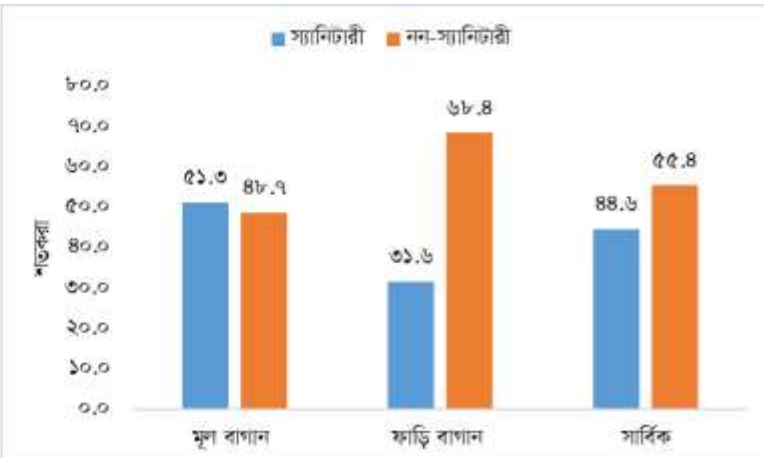

জরিপে দেখা গেছে ৭৪.৯% উত্তরদাতা শৌচাগার ব্যবহার করে এবং ২৫.১% কোনো শৌচাগার বা টয়লেট ব্যবহার করে না। তারা খোলা জায়গায় তাদের প্রক্ষালনের কাজ সম্পন্ন করে। যারা জানিয়েছেন শৌচাগার ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে ৫৫.৪% উত্তরদাতা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করছে না। আর ৪৪.৬% শ্রমিক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করছেন বলে উল্লেখ করেন। অস্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের সংখ্যা (৬৮.৪%) বেশি, যা মূল বাগানে ৪৮.৭%।

যেসব উত্তরদাতা শৌচাগার ব্যবহার করে, তাদের ৭৪.৯% শৌচাগার নিজে তৈরি করেছে। মাত্র ১৭.৮% শৌচাগার বাগান কর্তৃপক্ষ তৈরি করে দিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। পর্যবেক্ষণ ও মুখ্য তথ্যদাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৪৬টি বাগানে বাগান কর্তৃপক্ষ কখনো কোনো শৌচাগারের ব্যবস্থা করেনি। ১১টি বাগানে এক থেকে পাঁচটি শৌচাগার তৈরি করে দিয়েছে। ১০টি থেকে ১৫টি শৌচাগার তৈরি করে দিয়েছ চারটি বাগানে। বেশ কিছু শৌচাগারের ব্যবস্থা করেছে এমন বাগানের সংখ্যা মাত্র তিনটি। এই তিনটি বাগানে কর্তৃপক্ষ কিছু নতুন পাকা ঘর তৈরির পাশাপাশি শৌচাগারেরও ব্যবস্থা করেছে। অন্যান্য বাগানে যেসব শৌচাগার রয়েছে তার অনেকগুলোরই অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও ব্যবহার অনুপযোগী। বিশেষকরে এসব শৌচাগার স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম মেনে করা হয়নি। কাঁচা ও খোলা জায়গায় তৈরি করা হয়েছে যা পুরোপুরি অস্বাস্থ্যকর। অনেকেরই নিজের কোনো শৌচাগার নেই, তারা বাড়ির অন্যান্যদের শৌচাগার ব্যবহার করে। আবার বাগানে শ্রমিকদের শৌচাগার ব্যবহার না করার দীর্ঘ দিনের একটি অভ্যাস ছিল। বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বাগান কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার সাথে সাথে এসব এলাকার স্থানীয় সরকারও চা বাগানের শ্রমিকদের শৌচাগার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। স্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে তেমন কোনো কার্যক্রমও নাই বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে এনজিওগুলো এক্ষেত্রে কিছু সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করেছে।

সারণি ৪.১৫: শৌচাগার ব্যবস্থাকারী কর্তৃপক্ষ

ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাকারী কর্তৃপক্ষ	শতকরা
নিজে বানিয়েছে	৭৪.৯
কর্তৃপক্ষ	১৭.৮
এনজিও কর্তৃক	৫.০
স্থানীয় সরকার কর্তৃক	১.৩
প্রতিবেশীর	১.১

৪.৯.৮. আবাসনে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাস ও নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবস্থা

চা শ্রমিকদের আবাসনে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা আছে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় প্রায় সবকটি (৬৩টি) বাগানেই পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় সকল বাগান এবং এসব বাগানে বসবাসরত শ্রমিকদের আবাসিক এলাকা গ্রামীণ জনপদের

[৬৯] চা বাগনে পানী সরবরাহের কুয়া ও সাপ্লাইয়ের চিত্র দেখার জন্য পরিশিষ্ট ৯ দেখুন

[৭০] বিস্তারিত জানতে দেখুন বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ৫ এর (ক) (খ) ও (গ)

আবহে গড়ে উঠেছে, ফলে আবাসনগুলোতে আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত চলাচল রয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১১টি বাগানের শ্রমিকদের প্রায় সবগুলো বাড়িতে নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ৩৪টি বাগানে কোনো বাড়িতে নিরাপত্তা বেষ্টনী নাই এবং ১৯টি বাগানে কিছু বাড়িতে নিরাপত্তা বেষ্টনী আছে আর কিছু বাগানে নেই। যেসব বাড়িতে নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে সেসব বাড়ির নিরাপত্তা বেষ্টনী শ্রমিকরা নিজেই করে নিয়েছে। এখানে কর্তৃপক্ষ কোনোরকম ব্যবস্থা নেয়নি।

৪.১০. শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর তফসিল ৫ এর ৪ (ক) নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততির জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শ্রমিক সংগঠনের সাথে (যদি থাকে) আলোচনাক্রমে প্রত্যেক বাগানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা করবেন। এসব স্কুলে শ্রমিকদের ছয় থেকে ১২ বছর বয়সী সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাগান কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং সে লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ শ্রমিক পরিবারগুলো বাগানের যে এলাকাতে বাস করে, তার দের কিলোমিটারের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। তবে শ্রমিক পরিবারগুলো বাগানের যে এলাকায় বাস করে, তার দেড় কিলোমিটারের মধ্যে কোনো সরকারি স্কুল থাকলে, বাগান কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করলেও চলবে।[৭১] মূল কথা হল শ্রমিকদের ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাগান কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে। জরিপকৃত ৬৪টি বাগানের মধ্যে ২১টিতে শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে মূল বাগানে ১০টি এবং ফাড়ি বাগানে ১১টি। বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত স্কুল আছে ৬টি মূল বাগানে এবং ১টি ফাড়ি বাগানে। ৬টি বাগানে কোনো স্কুল নেই। যেসব বাগানে সরকারি স্কুল রয়েছে সেসব বাগানে মালিকের দেওয়া কোনো স্কুল নেই।

সারণি ৪.১৬: বাগানগুলোতে চলমান বিদ্যালয়ের ধরন

স্কুলের ধরন	বাগানের সংখ্যা		
	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	মোট
শুধু সরকারি বিদ্যালয়	১০	১১	২১
শুধু বাগানের বিদ্যালয়	৬	১	৭
শুধু এনজিও বিদ্যালয়	১	১	২
সরকারি ও এনজিও উভয়	৯	২	১১
বাগান ও এনজিও উভয়	১১	৬	১৭
কোনো ধরনের বিদ্যালয় নেই	৪	২	৬

৪.১০.১. বিদ্যালয়ের সমস্যা

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যেসকল বাগানে বাগানের নিজস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে, তার প্রায় সবগুলো স্কুলের চিত্র একই রকম। এসব স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক রয়েছে। একটি মধ্যম আকারের ঘরে একত্রে বসে প্রথম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করে। বিদ্যালয় বলতে যে কক্ষটি ব্যবহার করা হয়, তার বেশিরভাগ মাটির দেওয়াল ও উপরে টিনের চাল। একই কক্ষে সব শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রী বসে পাঠ গ্রহণ করছে। বিধিমালায় ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য এক জন শিক্ষকের[৭২] কথা উল্লেখ থাকলেও অনেক বাগানে ৪০ জনের অধিক শিক্ষার্থী থাকলেও একজন শিক্ষক দ্বারা পাঠদান করা হয়। প্রায় সবগুলো বাগানের স্কুলে দেখা যায় বসার জন্য পর্যাপ্ত বেঞ্চ নেই, বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা নেই, নেই আলমিরা বা কোনো আসবাবপত্র। বিনামূল্যে সরকারি যে বই দেওয়া হয়, তার বাইরে কোনো শিক্ষা উপকরণও নেই। শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক সন্তানদের মধ্যে থেকে নিয়োগ পায়, যারা সাধারণ শ্রমিক হিসেবে মজুরি পেয়ে থাকে এবং তাদের বেশিরভাগই অস্থায়ী ভিত্তিতে বেতন পায়। তবে কোনো কোনো বাগানে কিছু স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে, যারা নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে বেতন পান। বাগান পরিচালিত বেশিরভাগ বিদ্যালয়গুলো আসলে নাম মাত্র বিদ্যালয় রয়েছে। তথ্যদাতারা জানান, এসব বিদ্যালয়ে কোনো পড়ালেখা হয় না। এর চেয়ে বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো ভালো। সেখানের লেখাপড়ার মান ভাল। তাই শ্রমিকরা তাদের সন্তানদের বাগানের বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হয় না। সুতরাং যেসব বাগানে সরকারি, এনজিও স্কুল নেই সেসব স্কুলে শিশুদের পড়ালেখার অবস্থা খুব খারাপ। আবার চা বাগানে বাগান পরিচালিত স্কুলগুলোতে পিইসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে, তাদেরকে পার্শ্ববর্তী বা দূরের কোনো সরকারি স্কুলের আওতায় নাম দিয়ে বা টিসি দিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলের নির্ধারিত কেন্দ্রে পিইসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। বাগানের স্কুলগুলোর আরেকটি বঞ্চিত হওয়ার ধরন হচ্ছে তাদের উপবৃত্তি না দেওয়া। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে এখানকার স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি পায় না।

সম্প্রতি সরকার চা বাগানের ভিতরের (শ্রীমঙ্গলে ৩৪টি) বহু বাগানের স্কুলকে সরকারিকরণ ঘোষণা করেছে। কিন্তু এসব স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও অবকাঠামোগত দিক দিয়ে তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। এখনও বাগান কর্তৃক তৈরিকৃত দুটি কিংবা এক কক্ষের স্কুলেই পাঁচটি শ্রেণির ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারি ঘোষণা করলেও তার গুণগত তেমন পরিবর্তন হয়নি।

[৭১] বিস্তারিত জানতে দেখুন বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ৪ এর (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ)

[৭২] বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, তফসিল ৫ এর ৪ নম্বর বিধির (গ)

৪.১০.২. শ্রমিক সন্তানদের অধ্যয়নরত বিদ্যালয়ের ধরন

জরিপে দেখা গেছে ৫১.৪% পরিবারে ছয় থেকে ১২ বছরের ছেলে-মেয়ে রয়েছে। এসব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ৮৪.২% ছেলে-মেয়ে পড়ালেখা করার জন্য স্কুলে যায় এবং ১৫.৮% ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় না। যেসব বাচ্চা স্কুলে যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৪৪.২%) ছেলে-মেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় এবং ২৪.৫% এনজিও স্কুলে যায়। মাত্র ২১.৫% ছেলে-মেয়ে বাগানের স্কুলে পড়ালেখা করতে যায়।

চিত্র ৪.১৪: অধ্যয়নরত বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী শ্রমিক সন্তানদের হার

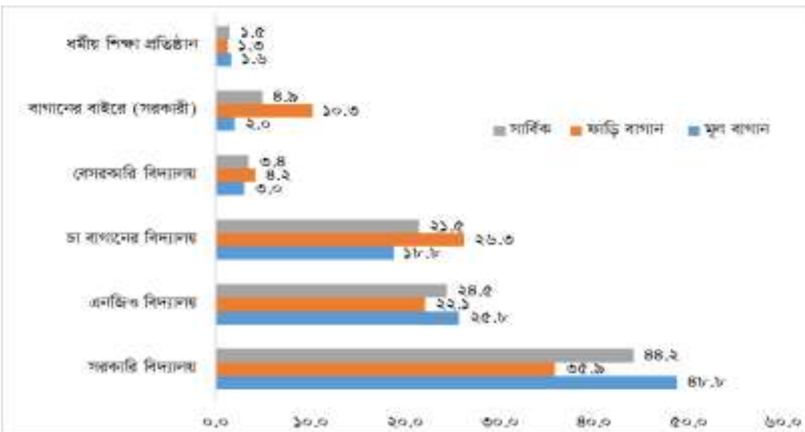

এছাড়া ৯.৮% ছেলে-মেয়ে বেসরকারি স্কুল বা ধর্মীয় স্কুল বা বাগানের বাইরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলে পড়ালেখা করে। সরকারি স্কুলের পড়ার হার ফাড়ি বাগানের (৩৫.৯%) তুলনায় মূল বাগানে (৪৮.৮%) বেশি। আবার চা বাগানের স্কুলে পড়ার হার মূল বাগানের (১৮.৮%) তুলনায় ফাড়ি বাগানে (২৬.৩%) বেশি। তথ্যদাতাদের মতে, বাগান কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার মান ভাল নয়। বিদ্যালয়গুলো ঠিকমত খোলেও না। ফলে শ্রমিকরা তাদের সন্তানদের বাগানের বিদ্যালয়ে পড়াতে চায় না, বরং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোই তাদের পছন্দ। যেসব বাগানে বিকল্প আর কোন ব্যবস্থা নেই, শুধু সেসব বাগানের শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে সন্তানদের বাগান কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে পড়তে পাঠায়।

৪.১০.৩. বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ

যেসব ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় না তাদের মধ্যে ২৫.০% শিশুকে এখনও ভর্তি করানো হয়নি যারা ভর্তি করানোর অপেক্ষায় রয়েছে আর ২৫.০% শিশু স্কুল নাই বা স্কুল অনেক দুরে থাকার কারণে স্কুলে যেতে পারছে না। ২৩.১% ছেলে-মেয়ের স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ নাই বা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে স্কুলে যাচ্ছে না। অন্যান্যদের মধ্যে ১০.৬% অর্থের অভাব বা দারিদ্রতার কারণে, ৫.৬% অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী, ৫.৬% ছেলে-মেয়ের মা-বাবা কাজে যাওয়ায় তাদের বাসায় থাকতে হয়, ৫.০% ছেলে-মেয়ে বাগানে কাজ করে, এজন্য স্কুলে যেতে পারে না।

সারণি ৪.১৭: ৬-১২ বছরের শিশুর স্কুলে না যাওয়ার কারণ (শতকরা)

কারণসমূহ	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	সার্বিক
এ বছর ভর্তি করবে	২৭.৪	২১.৫	২৫.০
বিদ্যালয় নাই বা অনেক দুরে	২৩.২	২৭.৭	২৫.০
ইচ্ছাকৃত যায় না বা আগ্রহ নাই	২৫.৩	২০.০	২৩.১
টাকার অভাব বা দরিদ্রতার কারণে	৮.৪	১৩.৮	১০.৬
অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী	৪.২	৭.৭	৫.৬
বাসায় থাকতে হয়	৫.৩	৬.২	৫.৬
বাগানে কাজ করে	৬.৩	৩.১	৫.০

তবে বাগানের শ্রমিক সন্তানদের মধ্যে লেখাপড়ার হার গত কয়েক বছরে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বেশিরভাগ শ্রমিক পরিবারের উপযুক্ত সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে কোনোরূপ আর্থিক সহায়তা করা হয় না। শ্রমিকদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টায় তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা নিতে হয়। চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে তাদের সন্তানদের কোটা সুবিধা দেওয়া হোক। কিন্তু যেহেতু চা শ্রমিকদের সামগ্রিকভাবে কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে ধরা হয় না, তাই তারা কোটা সুবিধাপ্রাপ্ত হয় না। চা শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ২.৫ কোটি টাকা মূলধনের একটি শিক্ষা ট্রাস্ট সরকার গঠন করেছে। যার চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই ট্রাস্টের বিনিয়োগকৃত মূলধনের জন্য বছরে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায়, তা দিয়ে মেধাবী শ্রমিক সন্তানদের এককালীন সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তথ্যদাতারা জানান, অধিকাংশ শ্রমিক পরিবার এই ট্রাস্ট সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই ট্রাস্ট থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তান কি না, তা প্রত্যয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বাগানের ব্যবস্থাপকের প্রত্যয়ন প্রয়োজন হয়। আবেদনের ফর্মও বাগান অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু অনেক বাগানের ব্যবস্থাপকেরাও এই ট্রাস্ট সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে তথ্য পাওয়া যায়।

৪.১১. চিকিৎসা সেবা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, তফসিল-৫ এর ৬ (১) এর (ক) অনুযায়ী প্রত্যেক চা বাগানের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের এবং পরিবারবর্গের জন্য অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগ চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা বাগান কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং সেই অনুসারে প্রত্যেক বাগানে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪.১১.১. বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র ও সুযোগ-সুবিধা

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ১১টি বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র বা ডিসপেনসারি নাই যার মধ্যে ফাড়ি বাগানের ৯টি।

আর যেসব বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র আছে (৫৩) তাদের মধ্যে ১৩টিতে বহির্বিভাগে রোগীদের জন্য কোনো বসার জায়গা নেই। ৪১টি বাগানের মধ্যে অন্তবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা নাই। এর ক্ষেত্রে মূল বাগানের ৩৯টির মধ্যে ২৯টিতেই অন্তঃবিভাগের সেবা নাই আর ১৪টি ফাড়ি বাগানের মধ্যে ১২টিতেই অন্তঃবিভাগীয় সেবা নেই। আর ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৩২টিতে বেড আছে বলে তথ্য পাওয়া যায় যার মধ্যে মূল বাগান ২২টি এবং ফাড়ি বাগান ১০টি। যে ১৭টি বাগানে অন্তঃবিভাগীয় সেবা আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব চিকিৎসা কেন্দ্র পরিদর্শনে দেখা গেছে দুই-একটি বাগান ছাড়া কোনো বেডেই রোগী ভর্তি নাই। বেশিরভাগ বাগানে এক থেকে দুটি বেড আছে শুধু রোগীকে শুইয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য, যেখানে রোগী ভর্তি করে রাখা হয় না বা অন্তঃবিভাগীয় কোনো সেবা দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ বেডের অবস্থা নোংরা, বেড কভার নাই, ভাঙ্গা, নাম মাত্র একটি ফোম দেওয়া রয়েছে যা ব্যবহার উপযোগী নয়। অনেক চিকিৎসা কেন্দ্রে কোনো টয়লেট নাই। আর যেসব চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে টয়লেট রয়েছে তাও ব্যবহার অনুপযোগী। এখানে জলের অভাবও লক্ষণীয়। যেসব বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে মাত্র ৭টি বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট আছে। অথচ প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকার নিয়ম রয়েছে। এর মধ্যে ফাড়ি বাগানের কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট নাই। ৪২টি বাগানে কম্পাউন্ডার, ৪১টি বাগানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী, ১৭ খণ্ডকালীন এমবিবিএস ডাক্তার এবং ৬টি বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স আছে। চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী স্টাফ হিসেবে ফাড়ি বাগানের তুলনায় মূল বাগানের অবস্থা ভাল। তবে কোনো কোনো ফাড়ি বাগানের শ্রমিকরা মূল বাগান কাছাকাছি হওয়ার কারণে মূল বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে সেবা নিয়ে থাকে। ৪টি বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে পুরুষদের জন্য সাধারণ ওয়ার্ড এবং ৪টি কেন্দ্রে নারীদের জন্য সাধারণ ওয়ার্ড রয়েছে যা শুধুই মূল বাগানে অবস্থিত। তথ্যদাতারা জানান, এই কেন্দ্রে ডায়রিয়া ও কলেরার মত জরুরি প্রয়োজনে দু-এক রাত রোগীকে রাখা হয়। এর বাইরে সব রোগীকে প্রয়োজন হলে উপজেলা বা আরো উচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় সবগুলো বাগানে কোনো স্থায়ী এমবিবিএস ডাক্তার ও প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত নার্স না থাকায়, সেই অর্থে কোনো অন্তঃবিভাগীয় সেবা দেওয়া হয় না।

সারণি ৪.১৮: বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে স্টাফদের সংখ্যা

মেডিকেল স্টাফ	বাগানের সংখ্যা		
	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	মোট
মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট আছে	৭	০	৭
ড্রেসার আছে	৩৩	১২	৪৫
কম্পাউন্ডার আছে	৩০	১২	৪২
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী আছে	৩৫	৬	৪১
মিডওয়াইফ আছে	২৪	৯	৩৩
খণ্ডকালীন এমবিবিএস ডাক্তার আছে	১২	৫	১৭
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্স আছে	৫	১	৬
পুরুষদের সাধারণ ওয়ার্ড আছে	৪	০	৪
মহিলাদের সাধারণ ওয়ার্ড আছে	৪	০	৪
অন্যান্য (সুইপার, মেসেঞ্জার, স্বাস্থ্যকর্মী)	১	৩	৪

বেশিরভাগ চা বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবার কোনো ব্যবস্থা নাই। বেশিরভাগ প্রসব বাড়িতেই হয় এবং ধাত্রী বাড়িতে গিয়ে সেবা দেয়। আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো কোনো ব্যবস্থা চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে নাই। বেশিরভাগ বাগানের হাসপাতাল বা ডিসপেনসারিতে একজন ড্রেসার বা একজন কম্পাউন্ডার ও একজন ধাত্রী দায়িত্বে থাকেন। তবে কোনো কোনো বাগানে একজন মিডওয়াইফ বা আরেকজন অতিরিক্ত মহিলা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে। আর কোনো কোনো ফাড়ি বাগানের জন্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে ছোট্ট একটি মাটির ঘরে কম্পাউন্ডার মাঝে মাঝে আসে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরবরাহ করে, যিনি খুব অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করে। সাধারণত সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন যায় এবং প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টা থাকে। আবার এই কম্পাউন্ডার কোন সময় আসবে বা কত সময় থাকবে তা নির্দিষ্ট করা নাই। ফলে রোগীদের পক্ষে তার আসার সময় না জানার কারণে দেখানো সম্ভব হয় না। যেসব বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে এমবিবিএস ডাক্তার আসে তারা সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন অল্প সময়ের জন্য রোগী

দেখেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। কোনো কোনো ফাড়ি বাগানের রোগীরা মূল বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র কাছাকাছি থাকার কারণে সেখান থেকে সেবা নিয়ে থাকে। তবে বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য মতে, ডেলিভারি বা গুরুতর কিছু হলে শ্রমিকদেরকে পার্শ্ববর্তী কোনো সরকারি হাসপাতাল বা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

৪.১১.২. বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র হতে সেবা গ্রহণের হার ও সেবা প্রদানকারী

জরিপে দেখা গেছে ৭৫.৪% পরিবারের সদস্যরা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছে বা চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা নিতে গিয়েছেন। এর মধ্যে মূল বাগানের ৭৪.৩% এবং ফাড়ি বাগানের ৭৭.৪% শ্রমিক বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে সেবা নিয়েছেন। যারা চা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছে বা সেবার জন্য গিয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৪৭.৬%) শ্রমিক সেবা নিয়েছে কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে।

সারণি ৪.১৯: বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
কম্পাউন্ডার	৪১.০	৬১.৬	৪৭.৬
ডাক্তার	২৬.৫	১২.৪	২১.৯
নার্স/ধাত্রী	২১.১	৭.৯	১৬.৮
ড্রেসার	১১.২	১৭.৫	১৩.২
কাউকে পাওয়া যায়নি	০.২	০.০	০.১
মিডওয়াইফ	০.১	০.৭	০.৩

এছাড়া ২১.৯% শ্রমিক ডাক্তারের কাছ থেকে, ১৬.৮% নার্স বা ধাত্রী, ১৩.২% ড্রেসারের নিকট থেকে সেবা নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু রোগী চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে কাউকেই পায়নি। এই না পাওয়ার হার মূল বাগানের চেয়ে ফাড়ি বাগানে বেশি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে মূল বাগানে (২৬.৫%) ফাড়ি বাগানের (১২.৪%) তুলনায় বেশি রোগী ডাক্তারের নিকট থেকে সেবা নিয়েছে। অর্থাৎ মূল বাগানে ফাড়ি বাগানের ডিসপেনসারিতে ডাক্তার বেশি পাওয়া যায়। অন্যদিকে ফাড়ি বাগানে যেহেতু ডাক্তার কম পাওয়া যায় সেহেতু তারা কম্পাউন্ডারের নিকট থেকেই বেশি সেবা নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের ৬১.৬% শ্রমিক কম্পাউন্ডারের নিকট থেকে এবং ৪০.০% মূল বাগানের শ্রমিক কম্পাউন্ডারের নিকট থেকে সেবা নিয়েছে।

৪.১১.৩. বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র হতে প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতা

বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যারা সেবা নিয়েছে, তাদের মধ্যে ৩৮.৩% সেবাগ্রহীতা প্রয়োজনীয় সকল ওষুধ বাগান থেকে পেয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। ওষুধ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মূল বাগানের (৪২.৬%) সেবাগ্রহীতারা ফাড়ি বাগানের (৩০.৮%) তুলনায় বেশি ওষুধ পাচ্ছে। ৫১.৮% সেবাগ্রহীতা কিছু ওষুধ পেয়েছিল যার মধ্যে ফাড়ি বাগানের ৫৮.১% সেবাগ্রহীতা এবং মূল বাগানের ৪৮.২% সেবাগ্রহীতা ছিল। ৯.৯% সেবাগ্রহীতা কোনো ওষুধ পায়নি যার হার ফাড়ি বাগানে ১১.২% এবং মূল বাগানে ৯.২%।

চা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নেওয়ার সময় যাদের (৬১.৭%) বাইরে থেকে ওষুধ ক্রয় করতে হয়েছে তাদের মধ্যে ৭৯.১% সেবাগ্রহীতার কোনো খরচই বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদান করেনি বলে তথ্য পাওয়া যায়। মাত্র ৩.৯% সেবাগ্রহীতার পুরো ওষুধের ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদান করেছে এবং ১৭% সেবাগ্রহীতার আংশিক ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদান করেছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। দলীয় আলোচনা ও মুখ্য তথ্যদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বেশিরভাগ সময় প্যারাসিটামল আর নাপা ছাড়া তেমন কোনো ভালো ঔষধ পাওয়া যায় না। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে একমাত্র ডিসপেনসারি যেখানে সব রোগের জন্যে ঘুরে ফিরে একই ঔষধ দেওয়া হয় বলে শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী বা বাহিরের ডাক্তার দেখান। চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কম্পাউন্ডারদের মতে কর্তৃপক্ষকে যেসব ওষুধ সরবরাহ করার জন্য লিস্ট পাঠানো হয় কর্তৃপক্ষ পক্ষ থেকে তা সরবরাহ করা হয় না। ভাল মানের ওষুধ সরবরাহ করতে চাহিদা পাঠালে নিম্ন মানের ওষুধ দেয়, তাও যে পরিমাণ ওষুধের চাহিদা দেওয়া হয় সে পরিমাণ সরবরাহ করা হয় না।

৪.১১.৪. জরুরি প্রয়োজনে বাড়িতে এসে চিকিৎসা সেবা

চা শ্রমিকদের জরুরি কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বাগানের ডিসপেনসারি বা হাসপাতাল থেকে নিযুক্ত চিকিৎসক বাড়িতে এসে চিকিৎসা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।[৭৩] কিন্তু জরিপে দেখা গেছে জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময় থেকে বিগত ছয় মাসে ৩৬.৩% শ্রমিক

[৭৩] বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, বিধি ৯৬, তফসিল ৫, উপধারা ৬ (১) (খ)

জরুরি প্রয়োজনে বাগানের কর্মরত চিকিৎসককে বাসায় ডাকলেও, তিনি আসেন নি। এই সেবা না পাওয়ার হার মূল বাগানের (৩২.১%) তুলনায় ফাড়ি বাগানে (৪৫.২%) বেশি।

৪.১১.৫. বাগানের স্বাস্থ্যসেবায় শ্রমিকের সন্তুষ্টির মাত্রা

যারা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিক, ৩৪.৭% বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবায় অসন্তুষ্ট। এদের মধ্যে ৯.৩% আবার খুবই অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্টির মাত্রা মূল বাগান থেকে ফাড়ি বাগানে বেশি। এবং চিকিৎসা সেবা নেওয়াদের মধ্যে ২৮.৯% শ্রমিক বাগানের চিকিৎসা সেবায় সন্তুষ্ট, যাদের মধ্যে ২.৮% খুবই সন্তুষ্ট।

চিত্র ৪.১৫: বাগানের চিকিৎসা সেবায় শ্রমিকের সন্তুষ্টির মাত্রা

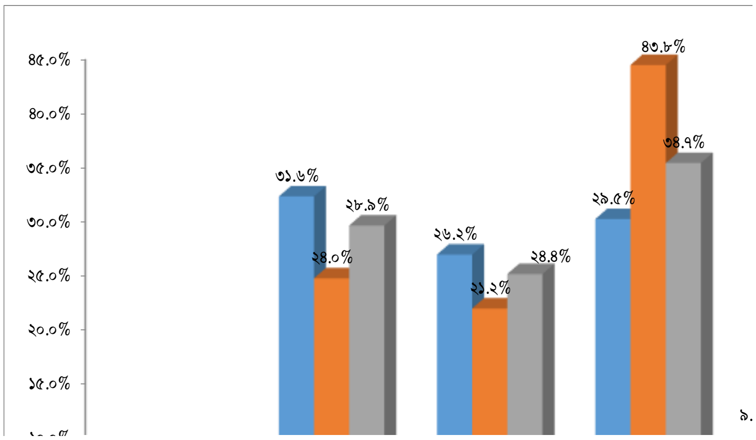

৪.১১.৬. বাগানের বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ ও তার ব্যয় বহন

বাগানের বাইরে কোন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়েছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৩৬.৯% শ্রমিক জানান যে তারা বাগানের বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ৪.১৬: বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকের বাইরে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ব্যয় বহনের হার

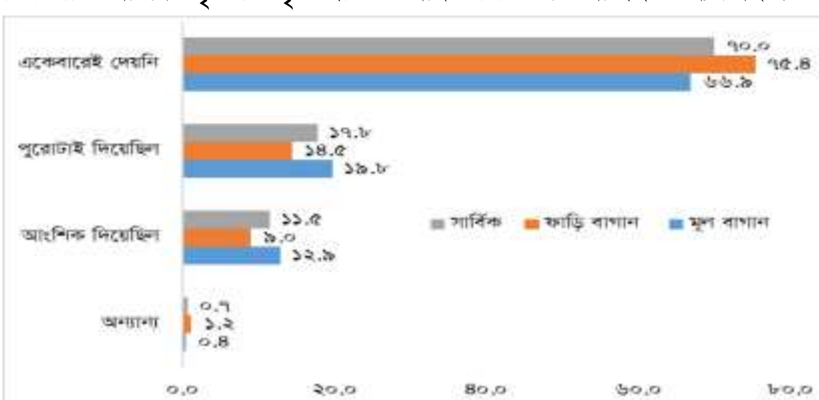

এদের মধ্যে ৭০.০% জানান যে বাগান থেকে তাদেরকে বাইরে গ্রহণকৃত চিকিৎসার কোনো খরচই দেওয়া হয়নি। কোনো খরচ না দেওয়ার হার ফাড়ি বাগানে (৭৫.৪%) মূল বাগানের (৬৬.৯%) তুলনায় বেশি। ১৭.৮% উত্তরদাতা জানান পুরো খরচই বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদান করেছে। আর ১১.৫% জানান বাগান কর্তৃপক্ষ আংশিক খরচ দিয়েছে। এসব শ্রমিকদের বাইরের চিকিৎসার জন্য গড়ে ৭১৬০ টাকা খরচ হলেও বাগান থেকে তাদের দেওয়া হয়েছে গড়ে মাত্র ৯৩৯ টাকা। এই খরচ না দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ রেফার না করার অজুহাত দেখায় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। অনেক সময় গুরুতর কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ভালো চিকিৎসার জন্যে কোনো প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা করালে কর্তৃপক্ষ কোনো টাকা দেয় না বা কোনো ব্যয়ভার বহন করে না।

কর্তৃপক্ষ শুধু বাগান থেকে রেফার করা রোগীদের ক্ষেত্রে কিছু টাকা দিয়ে থাকে। তারা শুধু সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করে, এবং সেখানে চিকিৎসা নিলেই খরচ বহন করে। আবার বেশি খারাপ অবস্থার রোগীদের ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বা দূরে কোনো বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি হলে বেশিদিন (১৫ - ৩০ দিন) ভর্তি থাকলে বা অবস্থান করলে সর্বোচ্চ প্রথম এক সপ্তাহ খবর রাখে এরপর আর কর্তৃপক্ষ কোনো খোঁজ খবর রাখে না। তবে এই সেবা শুধু স্থায়ী শ্রমিকদের দিয়ে থাকে, কোনো অস্থায়ী শ্রমিক বা পরিবারের নির্ভরশীল কোনো সদস্যকে বাহিরে চিকিৎসা করালে বাগান কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যয়ভার বহন করে না। অনেক বাগান তার শ্রমিকদের কোম্পানির নিজস্ব তৈরি গ্রুপ হাসপাতালে পাঠায় বা রেফার করে। এক্ষেত্রে আরো ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নারী শ্রমিকদের। প্রথমে কম্পাউন্ডার গ্রুপ হাসপাতালে পাঠায় এবং অনেক বাগান থেকে গ্রুপ হাসপাতালের দুরত্ব অনেক বেশি, সেখানেও যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় রেফার করে সরকারি হাসপাতালে। ফলে রাস্তার মধ্যে অনেক নারী শ্রমিকের প্রসবের সময় পার হয়ে যায় এবং রাস্তায় প্রসব হতে দেখা যায়। পর্যাপ্ত চিকিৎসা না পাওয়ায় নারী শ্রমিকের শিশু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে কর্তৃপক্ষের গাফিলতা, হাসপাতালের দুরত্ব এবং চা বাগানগুলো প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থান করায় চিকিৎসা সেবায় চা বাগান শ্রমিকদের দুরবস্থার হার অনেক বেশি। তবে সরকার থেকে নিয়মিত টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং গর্ভবতী মা ও শিশুদের নিয়মিত টিকা দেওয়া হয় বলে শতভাগ শ্রমিক জানিয়েছেন।

বক্স ৪.৩: ফাড়ি বাগানের একজন পুরুষ শ্রমিকের ভাষ্য

আমাদের বাগানে একজন ড্রেসার নিয়োগ দিয়ে চিকিৎসার কাজ চালিয়ে দেন। তার বেতন ধরা হয় দৈনিক ভিত্তিতে ৮৫ টাকা এবং সাথে সপ্তাহে ৩ কেজি রেশন। উনি আসে সকাল ৮ টায়, শুধু অসুস্থতা জনিত শ্রমিকদের ছুটির হিসাব নিয়ে চলে যায়। একবার পেটে ব্যথা হলো সহ্য করার মত না। বাগান থেকে ধলা ধলা কয়েকটা বড়ি দিলো, দুইদিন খেয়ে কোনো কাজ হলো না। মূল বাগানের কম্পাউন্ডারের পরামর্শে উপজেলায় বাগান নির্ধারিত একজন ডাক্তার কে দেখালাম, পেট টিপা টিপা কিছু বড়ি দিল, বাহির থেকে কিনে এনে খাইলাম কিন্তু কোনো কাজ হলো না। অবস্থা গুরুতর হলে বাগান কর্তৃপক্ষ আর আসে না শুধু গড়িমসি করে। বাধ্য হয়ে নিজের গরুটা বিক্রি করে নিজ থেকে বাইরের হাসপাতালে ডাক্তার দেখালাম। অপারেশন করালাম প্রায় ১,০০,০০০ টাকা চিকিৎসা খরচ হয়েছিল। বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে বিল জমা দিতে চাইলে নেয় নি। পরবর্তীতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনুরোধ করলে বাগান থেকে মাত্র ৪,০০০ টাকা আমাকে দেয়। বাগানের ভরসায় থাকলে আমি ঐবার মারা যেতাম।

৪.১১.৭. বাগানের বাইরে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের কারণ

যেসকল শ্রমিক বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা (৩০.৩%) জানান যে, চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে রেফার করেছিল বলে বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন। বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রের অবহেলার জন্য তারা বাইরের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছে ২৬.১% সেবাগ্রহীতা। ২৫.৭% সেবাগ্রহীতা বাগানের চিকিৎসা ও ওষুধ ভাল না হওয়া, ১৩.৯% চা বাগানের হাসপাতালে ডাক্তার না থাকা এবং ৭.১% বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার জন্য বাইরের হাসপাতাল থেকে সেবা নিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী রোগীর এটেন্ডেন্টসহ সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার যাবতীয় খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করার কথা থাকলে বেশির ভাগ বাগানে কখনই পুরোপুরি খরচ দেওয়া হয় না বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে সবার জন্য চিকিৎসা উন্মুক্ত না/আর রেশন যেমন বাচ্চার ১২ বছর হওয়ার পর আর দেওয়া হয় না তেমনি কোনো বাচ্চার বয়স ১২ বছর হলে তাকে আর বাহিরে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে খরচ কোম্পানি বহন করে না। শুধু স্থায়ী শ্রমিকদের বাহিরে চিকিৎসা করানোর খরচ কোম্পানি বহন করে। কোনো কোনো স্থায়ী শ্রমিকের জন্যও বেশির ভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ বাহিরে চিকিৎসার মোট খরচের সর্বোচ্চ অর্ধেক শ্রমিকদেরকে দিয়ে থাকে। কোনো কোনো বাগানে এই অর্থ পেতে তেমন সময়ক্ষেপণ করতে হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ বাগানে এই অর্থ পেতে প্রায় ১ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করতে হয়। অনেক শ্রমিকের অভিযোগ বাহিরে চিকিৎসার জন্য সব টাকা তারা নিজে খরচ করে পরে অফিসে বিল জমা দেয়। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন টাকা না দিয়ে সময়ক্ষেপণ করে, অনেক সময় বিলের কপি গায়েব করে ফেলে বা হারিয়ে ফেলে। এ বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ বলেন চিকিৎসার সব টাকা তারা ইচ্ছা করলেই দিতে পারে না। কিছু টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়ার অনুমতি থাকলেও সেটা

সারণি ৪.২০: বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা নেওয়ার কারণ (শতকরা)

কারণসমূহ	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	সার্বিক
বাগানের হাসপাতাল থেকে রেফার করেছিল	২৮.৭	২৪.২	২৭.১
বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের অবহেলার জন্য	২৮.৯	২১.২	২৬.১
বাগানের চিকিৎসা ভালো না ও ওষুধ ভাল না	২৩.২	৩০.৪	২৫.৭
চা বাগান হাসপাতালে ডাক্তার নাই	১২.২	১৬.৯	১৩.৯
বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র নাই	৭.০	৭.৩	৭.১

নিয়ে কর্তৃপক্ষ গরিমসি করে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে বিল জমা হয় তা বাগানের প্রধান কার্যালয় থেকে পাস হয়ে আসলেই কেবল প্রদান করা সম্ভব।

৪.১২. সঞ্চয়

চা শ্রমিকরা সাধারণত দুই ভাবে সঞ্চয় করে থাকে, ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয়। প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকে টাকা জমানো, বিভিন্ন এনজিওতে সঞ্চয় করা, সরকারি ও বেসরকারি বিমা এবং ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়ে সঞ্চয়।

চিত্র ৪.১৭: শ্রমিক পরিবারের সঞ্চয় থাকার হার

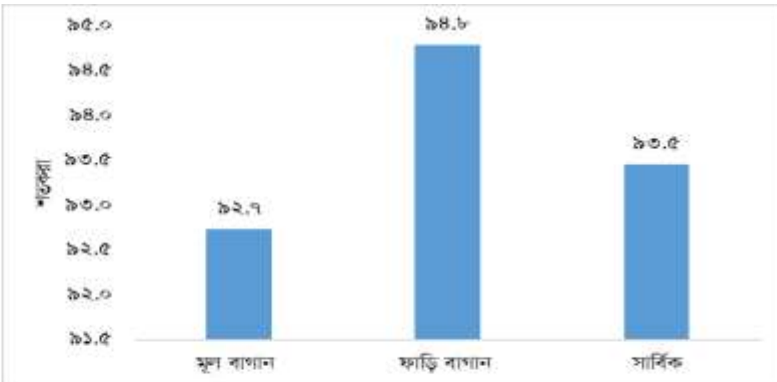

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৯৩.৫% চা শ্রমিক জানিয়েছেন তাদের সঞ্চয় আছে। সঞ্চয় থাকার ক্ষেত্রে মূল বাগান (৯২.৭%) থেকে ফাড়ি বাগানের (৯৪.৮%) হার কিছুটা বেশি। ৬.৫% শ্রমিক পরিবারের কোনো ধরনের সঞ্চয় নাই। জরিপে আরো দেখা যায় যাদের সঞ্চয় আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রমিকের প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় রয়েছে, ৯২.৬% যা মূল বাগানে ৯২.১% ও ফাড়ি বাগানে ৯৩.৪%। এছাড়া মাত্র ৭.৪% শ্রমিকের পরিবারের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় বা শুধু ব্যক্তিগত সঞ্চয় আছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। যাদের প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় আছে তাদের ৮৮.৪% শ্রমিক পরিবারের চা বাগানের ভবিষ্য তহবিলে সঞ্চয় বা সুবিধা আছে যা মূল বাগানে ৮৬.৬% ও ফাড়ি বাগানে ৯১.৫%। সুতরাং বলা যায় চা বাগান শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিল তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান অবলম্বন এবং বাগান কর্তৃপক্ষের অংশসহ এর পরিমাণ মাসিক ৩৫০ থেকে ৩৬০ টাকা।

৪.১৩. ভবিষ্য তহবিল

চিত্র ৪.১৮: ভবিষ্য তহবিলে নাম থাকা না থাকার হার

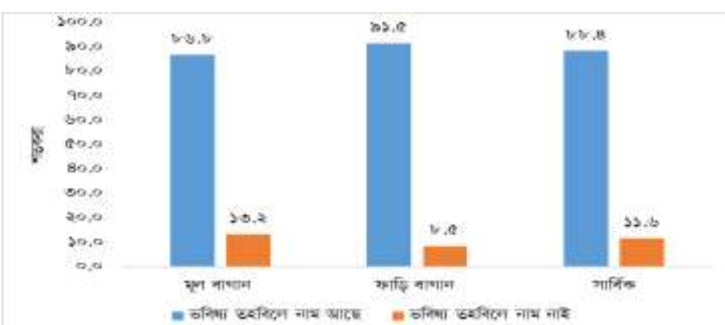

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী শিক্ষাধীন শ্রমিক ব্যতীত চা বাগানের চাকরিতে এক বৎসর পূর্ণ করিয়াছে এমন প্রত্যেক শ্রমিককে ভবিষ্য তহবিলের সদস্য হতে হবে।[৭৪] কিন্তু ভবিষ্য তহবিল কার্যালয় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নিয়মিত ভবিষ্য তহবিল সুবিধা পান ৯৩,৬৮৫ জন স্থায়ী শ্রমিক[৭৫] যেখানে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি নথি অনুযায়ী মোট স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১০০৮৪৩[৭৬]। অর্থাৎ প্রায় ৭.০৯% (৭১৫৮ জন) স্থায়ী শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্ত নয়। মূখ্য তথ্যদাতাদের মতে এই সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। ৬৪টি বাগানের মধ্যে ২টি বাগানে ভবিষ্য তহবিলের কোনো টাকা জমা করা হয় না। জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮৮.৪% স্থায়ী শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলে নাম আছে এবং ১১.৬% এর নাম নাই।

[৭৪] বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ২৭১ (১)

[৭৫] বাগান ওয়ারি নিয়মিত পি এফ সদস্য সংখ্যা, প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস, শ্রীমঙ্গল, তথ্য সংগ্রহ ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৭৬] স্ট্যাটিস্টিকস অন বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রি-২০১৫, প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, বাংলাদেশ টি বোর্ড

৪.১৩.১. ভবিষ্য তহবিলে নাম না থাকার কারণ

সারণি ৪.২১: ভবিষ্য তহবিলে টাকা জমা না হওয়ার কারণ (শতকরা)			
কারণসমূহ	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	সার্বিক
ভবিষ্য তহবিলের কোনো ব্যবস্থা নাই	৩৫.৪	৮.৮	২৮.৫
এখনও ফান্ডে নাম আসেনি	১৭.১	১৫.৮	১৬.৭
মালিকের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে জমা দেয় না	১৩.৪	১.৮	১০.৪
বাবুদের গাফিলতির কারণে	৬.১	১৫.৮	৮.৬
নিজেই ফান্ডে নাম দেয়নি	৭.৯	৭.০	৭.৭
অন্যান্য	২.৪	১৯.৪	৭.১
জানি না	১৭.৭	৩১.৬	২১.৩

জরিপে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক (২৮.৫%) জানান যে তাদের বাগানে ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের (৮.৮%) তুলনায় মূল বাগানে (৩৫.৪%) হার অনেক বেশি দেখা যায়। এরপরেই রয়েছে ফান্ডে নাম না আসা (১৬.৭%), মালিকের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে জমা দেয় না ১০.৪% ও বাবুদের গাফিলতির কারণে ৮.৬% শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের নাম নাই বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে ২১.৩% শ্রমিক জানে না যে কি কারণে তাদের ভবিষ্য তহবিলে নাম নাই, যার হার ফাড়ি বাগানে বেশি দেখা যায়।

৪.১৩.২. ভবিষ্য তহবিলের টাকা নিয়মিত জমা হওয়া

যে সকল শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলে নাম আছে তাদের মধ্যে ৮১.৭% জানিয়েছেন তাদের তহবিলের টাকা নিয়মিত ফান্ড অফিসে জমা হয় (নিচের চিত্র ৪.১৯), ১৭.৭% জানিয়েছেন যে টাকা জমা হয় কি না এ বিষয়ে জানে না এবং মাত্র ০.৬% উত্তরদাতার ফান্ড অফিসে টাকা নিয়মিত জমা না হওয়ার কথা বলেন।

চিত্র ৪.১৯: ভবিষ্য তহবিলে টাকা নিয়মিত জমা হওয়ার হার

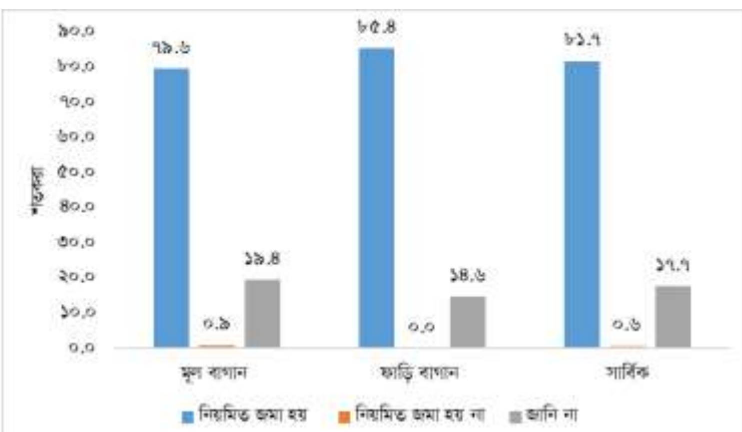

জরিপ চলাকালীন সময়ের পূর্বে সর্বশেষ বার ভবিষ্য তহবিলের কত টাকা কেটেছে তা জানে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ৮১.৫% জানান যে তারা উক্ত টাকার পরিমাণ জানেন। আর ১৮.৫% জানে না যে তাদের কত টাকা জমা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল বাগানের শ্রমিকরা (৮২.০%) ফাড়ি বাগানের শ্রমিকদের (৮০.৫%) চেয়ে বেশি জানে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

ভবিষ্য তহবিলের টাকা জমা না দেওয়ার সবচেয়ে বড় দুর্নীতি করা হয় বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে। বিধিমালা ২০১৫ এর ধারা ২৭৮ এবং কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী প্রতি শ্রমিকের মাসিক আয়ের ৭.৫% কেটে রাখে, কর্তৃপক্ষ ঐ ৭.৫% এর সমপরিমাণ অর্থ নিজে দিয়ে শ্রমিকের নামে জমা করবে এবং কর্তৃপক্ষ তার সাথে আরও ৫% প্রশাসনিক ব্যয় ফান্ড অফিস পরিচালনার হিসাব নম্বরে জমা দেবে। যেসব বাগানে শ্রমিক বেশি সেসব বাগানের ভবিষ্য তহবিলে টাকার পরিমাণও বেশি জমা হয়। আর টাকা জমা দেয় বাগান কর্তৃপক্ষ চেকের মাধ্যমে। বাগান কর্তৃপক্ষের অংশ সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে জমা দেবে বলে সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো বাগান কর্তৃপক্ষ উক্ত সুযোগটি নিয়ে নিজেদের অংশটি জমা দিতে দেরি করে বা কখনও কখনও জমাও দেয় না। কোনো কোনো বাগান কর্তৃপক্ষ ভবিষ্য তহবিলের টাকা বাগানের অংশতো জমা দেয়ই না এমন কি শ্রমিকের নিকট থেকে কেটে রাখা অংশও জমা না দিয়ে অন্য কাজে ব্যয় করে। এভাবে শ্রমিকের এবং মালিকের অংশ মিলিয়ে বড় অংকের একটা টাকা মালিকের কাছে বকেয়া পড়ে যায়। শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের টাকা ফান্ড অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।[৭৭]

[৭৭] শ্রম বিধিমাল ২০১৫, ২৭৮(২) নং ধারা

বক্স ৪.৪: ফাড়ি বাগানের একজন শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের নথি পাওয়া বিষয়ে বক্তব্য

আমি গতবার ফান্ডের কাগজ পেয়েছি (২০১৭ সালে)। সেখানে যে হিসাব ছিল সেটা তার ২ বছর আগের (২০১৫-১৬)। আমি কেমনে যাচাই করবো যে ফান্ডের হিসাব সঠিক আছে কি না। ২ বছর আগের হিসাব আসলে তো আমাদের স্মরণ থাকার কথা না। প্রতি মাসে যে টাকা কাটে তার হিসাব তো আমরা ২-৩ বছর ধরে রাখতে পারবো না। তাই নথিতে যা থাকে সেটাই আমরা সঠিক বলে ধরে নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কিছু করার নাই, আমরা অসহায়।

উক্ত অর্থ তিন মাসের মধ্যে জমা না হলে তা আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে।[৭৮] কোনো কোনো বাগান কর্তৃপক্ষ ৫ থেকে ৮ মাস পরে ভবিষ্য তহবিলের টাকা জমা দিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত ২৭টি বাগানের নিকট ভবিষ্য তহবিলের বড় অংকের টাকা বকেয়া রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এরমধ্যে ৫টি বাগানের কাছে বকেয়া টাকার পরিমাণ অনেক বেশি। এই ৫টি বাগানের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে এবং ২৫% জরিমানাসহ টাকা আদায়ের জন্য ফান্ড অফিস কর্তৃক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্য একটি বাগান এই সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বর্তমানে বন্ধের পথে। উদাহরণসরূপ, দুটি চা বাগানের ফান্ডে জমা দেওয়ার জন্য দের কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আরেকটি বাগানে অবসর প্রাপ্তদের জমানো প্রাপ্য ৯ লক্ষ টাকা ফান্ড অফিস থেকে বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় এবং উক্ত টাকা শ্রমিকদের না দিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ আত্মসাৎ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

৪.১৩.৩. ভবিষ্য তহবিল অফিসের নথি সরবরাহ

বিধিমালা ২০১৫ (ধারা ২৯৮) অনুযায়ী প্রতি বছর শেষ হবার পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রক অফিস প্রত্যেক সদস্যকে তার সর্বশেষ নিয়োগ কর্তার মাধ্যমে তহবিলের বছরের শুরুর প্রারম্ভিক স্থিতি, বছরে প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ, বছর শেষে মুনাফা এবং বছরের শেষে স্থিতির পরিমাণ উল্লেখ করে একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত বিবরণী সরবরাহ করিবেন।[৭৯]

চিত্র ৪.২০: ভবিষ্য তহবিলে টাকা জমার নথি সরবরাহের হার

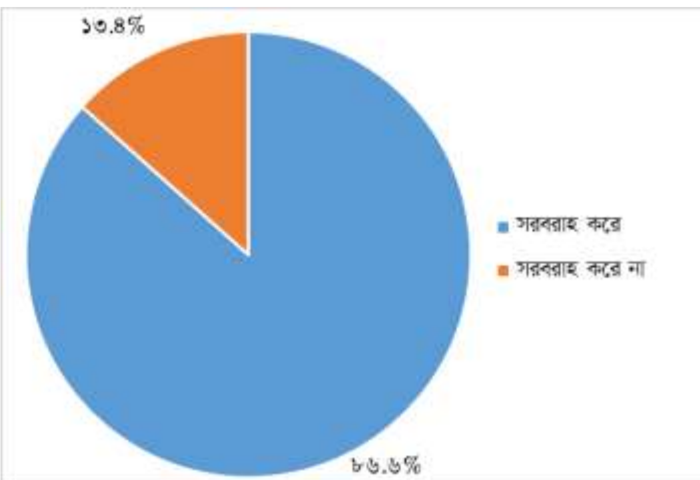

কিন্তু জরিপের দেখা যায়, প্রায় ১৩.৪% তথ্যদাতা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো নথি সরবরাহ করে না এবং প্রায় ৮৬.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন নথি সরবরাহ করে। নথি সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল বাগানের (৮৭.৯%) তুলনায় ফাড়ি বাগানে (৮৩.৯%) কম উত্তরদাতার নথি সরবরাহ করা হয় বলে জানিয়েছে। আর যারা নথি পায় কিংবা ভবিষ্য তহবিলের হিসাব সরবরাহ করে বলে জানিয়েছে তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (৮৬.৪%) দেখা যায় শ্রমিকদেরকে বাগানের অফিস হতে বছর শেষে একটি নির্দিষ্ট প্রিন্ট করা ছকে হাতে লেখা টাকার পরিমাণ সম্বলিত কাগজ পাঠানো হয়। উক্ত কাগজটি ভবিষ্য তহবিল কার্যালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিবরণী যা চা শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্য তহবিল অফিস থেকে বাগানের ব্যবস্থাপক বরাবর পাঠায়। বাগানের পঞ্চায়েত সদস্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সচেতন শ্রমিকরা প্রতি মাসে যখন ভবিষ্য তহবিলের টাকা ভবিষ্য তহবিল অফিসে বাগান থেকে প্রেরণ করে, তখন বি-ফর্মের[৮০] একটি কপি অফিস থেকে চেয়ে নেয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে উক্ত নথিতে যে পরিমাণ টাকা জমা করা হয়েছে তা সঠিক কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ শ্রমিক বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা জানান যে তারা কখনই হিসাব করে দেখেনি, বাগান থেকে যা দেয় সেটাই সঠিক বলে মনে করে।[৮১]

[৭৮] শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩), ধারা ২৯৮ (১)

[৭৯] বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, ধারা ২৯৮ (১)

[৮০] ভবিষ্য তহবিলের টাকার সাথে তহবিল অফিসে টাকার হিসাব সম্বলিত যে ফর্ম পাঠানো হয়

[৮১] সরবরাহকৃত নথির নমূনা পরিশিষ্ট ৯ এ দেওয়া হলো

৪.১৪. অবসর গ্রহণ, অবসরপ্রাপ্তদের ভবিষ্য তহবিল ও অবসর ভাতা

সর্বশেষ সমঝোতা স্মারক - এর ১৬নং চুক্তি অনুসারে চা শ্রমিকরা ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করবে। চুক্তিতে আরো বলা হয়েছে যে, স্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে যারা দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি পায় তারা সপ্তাহে ৬৫ টাকা এবং যারা মাসিক ভিত্তিতে বেতন পেত তারা সপ্তাহে ১০০ টাকা হিসেবে অবসর ভাতা প্রাপ্য হবেন। যারা কমপক্ষে ১৫ বছর স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে, তারাই এ ভাতা পাবেন।[৮২] তবে নিয়মে ৬০ বছর পরে অবসরে যাওয়ার কথা থাকলেও অনেককেই তার শারীরিক সক্ষমতা বা শ্রমিকদের প্রয়োজনের বিবেচনায় ৭০ বছর পর্যন্তও কাজ করে থাকে। আসলে বাগানের কাজ শ্রমনির্ভর হওয়ায় কর্মক্ষমতাই অবসর নেওয়ার জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়। কোনো শ্রমিক অবসর নিলে তিন মাসের মধ্যে ভবিষ্য তহবিলের টাকা পাবার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কোনো শ্রমিক অবসরে গেলে বাগান হতে এ সংক্রান্ত একটা নথি ভবিষ্য তহবিল অফিসে পাঠানো হয়। এরপর ভবিষ্য তহবিল অফিস উক্ত শ্রমিকের নাম কর্তনপূর্বক তার টাকা বাগানের ম্যানেজার বরাবর পাঠিয়ে দেয়। ম্যানেজার উক্ত শ্রমিকের নামে চেক কেটে দিলে শ্রমিক সেই চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা তুলে নেয়।

৪.১৪.১. ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রাপ্তি

জরিপে দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের ১৭.১% খানায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে। এদের মধ্যে ৯০.৫% শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ পেয়েছিল, ৬.৪% শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত টাকা পায়নি এবং ৩.১% শ্রমিক তখন সঞ্চয় করেনি বলে জানিয়েছেন। সঞ্চয়ের টাকা জমা না করার কারণ হিসেবে তারা জানান, ঐ সময়ে মজুরি এতই কম ছিল যে, তা থেকে সঞ্চয় করতে গেলে না খেয়ে মরতে হত। এখনও অনেকে এ কারণে সঞ্চয় করে না। যারা ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত টাকা পেয়েছেন তাদের মধ্যে ৮.৮% ভবিষ্য তহবিলের টাকা কম পেয়েছে আর ৯১.২% টাকা সঠিক পরিমাণেই পেয়েছে। যারা ভবিষ্য তহবিলের টাকা কম পেয়েছে তাদের অধিকাংশ বলতে পারেনি যে কি কারণে তারা টাকা কম পেয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে অফিস মেরে খেয়েছে, কর্তৃপক্ষ টাকা জমা করেনি, মধ্য পক্ষ কিছু টাকা সরিয়ে নেয় ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করেছেন।

৪.১৪.২. ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রাপ্তিতে সমস্যা

যারা ভবিষ্য তহবিলের টাকা পেয়েছে তাদের মধ্যে ২৮.৭% জানিয়েছে যে তাদের টাকা পেতে সময় অনেক বেশি লেগেছিল কিংবা ঘুষ দিতে হয়েছিল বা দুটোই করতে হয়েছিল। সমস্যা হওয়ার ক্ষেত্রে মূল বাগান (২২.৯%) থেকে ফাড়ি বাগানের (৩৯.৪%) হার বেশি।

চিত্র ৪.২১: ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রাপ্তিতে সমস্যার ধরন

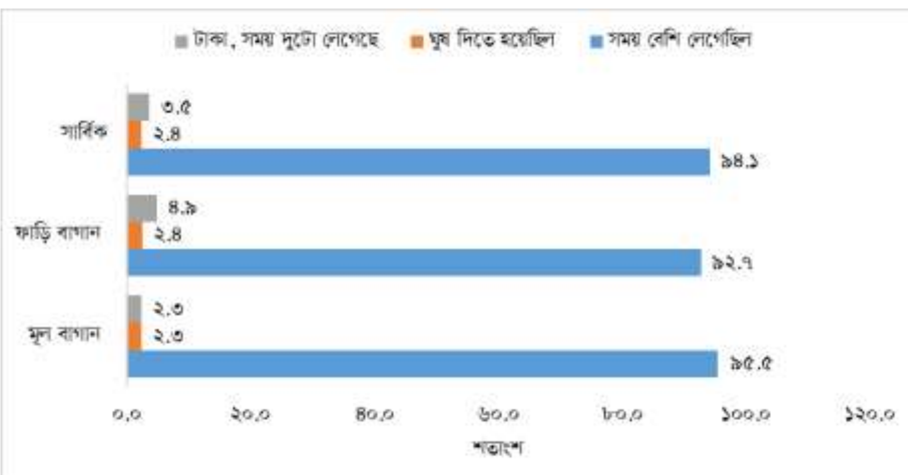

জরিপে দেখা গেছে প্রায় সকল অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককেই (৯৪.১%) তাদের ভবিষ্য তহবিলের টাকা পেতে সময়ক্ষেপণের শিকার হতে হয়েছে এবং তারা গড়ে প্রায় ১.৫ বছর অপেক্ষার পরে তাদের ভবিষ্য তহবিলের টাকা উত্তোলন করতে পেরেছিল। ভবিষ্য তহবিলের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপন ছাড়াও শ্রমিকদের বেশ কয়েকদিন পঞ্চায়েত ও ম্যানেজারের কাছে দৌড়াতে হয় বলে তথ্যদাতারা জানান। তহবিলের টাকা পেতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে না হলেও অনেকক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সদস্যদের মিষ্টি খেতে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা দিতে হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।

[৮২] Memorandum of Labour agreement, (01.01.2015 to 31.12.2016), ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরকৃত

৪.১৪.২. ভবিষ্য তহবিলের অর্থ না পাওয়ার কারণ

যেসব শ্রমিক জানিয়েছেন যে তারা ভবিষ্য তহবিলের টাকা পাননি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৩৮.১%) উত্তরদাতা জানেন না যে, কেন টাকা পাননি। বাবুদের অবহেলার কারণে তখন সঞ্চয় জমা করা হয়নি বলে জানান ২৩.৮% অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক।

চিত্র ৪.২২: ভবিষ্য তহবিলের টাকা না পাওয়ার কারণ

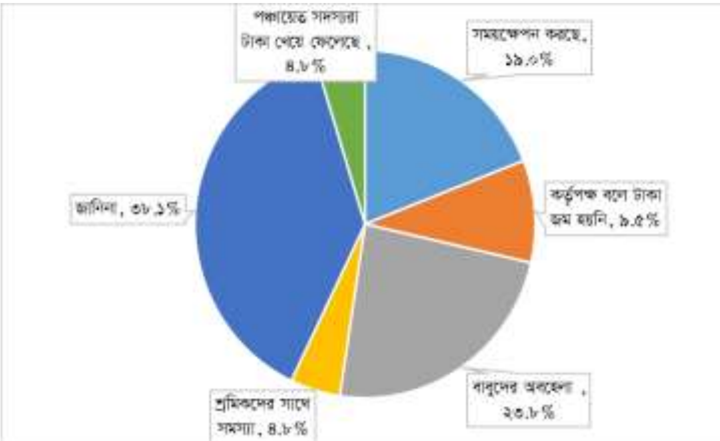

অন্যান্যদের মধ্যে ১৯.০% জানান যে তাদের তহবিলের টাকা নিয়ে সময়ক্ষেপণ করছে, দিচ্ছে না। বাগান শ্রমিকদের সাথে সমস্যা হয়েছে বলে ৪.৮%, পঞ্চায়েতের সদস্য টাকা খেয়ে ফেলছে ৪.৮%, এবং ৯.৫% শ্রমিকের মতে টাকা কেটে রাখলেও, কর্তৃপক্ষ বলে টাকা জমা হয়নি।

৪.১৪.৩. ভবিষ্য তহবিলের অর্থ না পাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ ও অন্যান্য

যেসব শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের টাকা পায়নি সেসব শ্রমিকরা কোথাও অভিযোগ করেছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ২১.৭% জানিয়েছে যে তারা পঞ্চায়েত, বাবু ও ম্যানেজারের নিকট অভিযোগ করেছিল। অভিযোগ করার পরে পঞ্চায়েত সদস্য বাগানের ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছে বলে দুইজন শ্রমিক তথ্য দেয়।

এছাড়াও ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা কম পাচ্ছে কি না ফাড়ি বাগানের শ্রমিকরা কখনই যাচাই করার সুযোগ পায় না। শ্রমিকদের নামে কত টাকা জমা হলো তার একটি বিবরণ প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস বাগানের ম্যানেজার বরাবর এক বছর পর পর প্রেরণ করে থাকে। কিন্তু বাগানের ম্যানেজারগণ তা কিছু কিছু বাগানের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শ্রমিকদের জানালেও কোনো কোনো ফাড়ি বাগানে তা পাঠানো হয় না। ফলে ফাড়ি বাগানের শ্রমিকদের পক্ষে ভবিষ্য তহবিলের টাকা কম পায় কি না তা কোনোভাবেই যাচাই করার সময় পায় না। তারা যখন তাদের ভবিষ্য তহবিলের টাকা উত্তোলন করে তখন অন্য শ্রমিকদের সাথে তুলনা করে জানতে পারে যে তাকে ভবিষ্য তহবিলের টাকা কম দেওয়া হয়েছে।

বক্স ৪.৫: একজন শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ কম পাবার ঘটনা

একজন শ্রমিক তার ভবিষ্যৎ তহবিলের মাত্র আট হাজার টাকা পেয়েছে। তিনি তার ভবিষ্য তহবিলে কত টাকা জমা হয়েছে তা টাকা পাওয়ার আগে জানতে পারে নি। যখন সে টাকা তুলতে গেল তখন দেখল যে তার টাকা কম দেওয়া হয়েছে। এরপরে সে সঠিক হিসাব অনুসারে তার ভবিষ্য তহবিলের টাকা পাওয়ার জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ করে। শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে যোগাযোগ করে দেখা গেছে তার ভবিষ্য তহবিলের টাকা বাগান কর্তৃপক্ষ তিন বার দীর্ঘ সময় ধরে ভবিষ্য তহবিল অফিসে জমা দেয়নি। পরবর্তীতে হিসাব করে দেখা গেছে তার ভবিষ্য তহবিলে মোট ১৬ হাজার টাকা জমা হওয়ার কথা ছিল এবং বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে বাকি আট হাজার টাকা তাকে পরিশোধ করা হয়।

বক্স ৪.৬: এক মৃত শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ না পাওয়ার তথ্য
আমার বাবা পাকিস্তান আমল থেকে বাগানে কাজ করতো। প্রায় ৩০ বছরের বেশি ফান্ডের টাকা প্রতি মাসে মজুরি থেকে কেটে নিয়েছে। বাবা পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন। ফান্ডের টাকার বিষয়ে কোনো কিছুই জানতে পাইনি। বর্তমান সাহেব বা বাবুকে বললে তারা বলে বাগান বেশ কয়েক বার বিক্রি হওয়ায় ফান্ডে টাকা আগের কর্তৃপক্ষ জমা করেনি। প্রতিটি কর্তৃপক্ষ তার আগের মালিকের উপর দোষারোপ করছে। তারা বলছে 'তোমার টাকা আগের কর্তৃপক্ষ মেরে খেয়েছে, ফান্ড অফিসে টাকা জমা দেয় নি। যারা টাকা জমা দেয় নি তাদের ধর।' মাঝখানে বাগান বন্ধ ছিল বেশ কয়েক বছর, তার পর আবার বাবা কাজ শুরু করেছিল এবং মোক্তার কর্তৃপক্ষ সব টাকা মাইরা দিয়া আর একজন মালিকের কাছে বাগান বিক্রি করে চলে গেছে। ঐ সময় কোনো ফান্ডের কাগজ দিত না বা দুই এক বছরের হিসাবের নথি পেলেও বাবা তা হারিয়ে ফেলেছে। পঞ্চায়েত বলে কাগজ নাই তাই টাকা পাওয়া যাবে না।

ভবিষ্য তহবিলের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটির বাগানের শ্রমিকরা আরেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। বেশিরভাগ শ্রমিক তাদের ভবিষ্য তহবিলের পুরো টাকা পায় না। যেহেতু প্রভিডেন্ট ফান্ড কার্যালয়টি শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটির শ্রমিকদের দূরত্বের কারণে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে শ্রীমঙ্গল থেকে শুরু করে এই টাকা চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন শ্রীমঙ্গলের যে ব্যক্তি পুরো ফান্ডের টাকার ব্যবস্থা করেন, শ্রমিকের নিজ বাগানের পঞ্চায়েত, সহকারী ম্যানেজার এর হাত ঘুরে আসতে তাকে কিছু টাকা খরচ বাবদ ব্যয় করতে হয়। ফলে তারা কখনই ভবিষ্য তহবিলের পুরো টাকা পায় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি বাগানের শতাধিক শ্রমিকের পাকিস্তান আমল থেকে ফান্ডের টাকা কাটা হলেও কেউই ফান্ডের টাকা পায়নি। গত কয়েক দশকে এই বাগানের দুই বা তার অধিক বার মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে এবং আগের বেশ কয়েকটি মালিক শ্রমিকের কাছ থেকে টাকা কাটলেও শ্রমিকের বা মালিকের কোনো অংশই ভবিষ্য তহবিল অফিসে জমা দেয় নি। এমন কি ঐ সকল শ্রমিকের ফান্ড অফিসে কোনো নামও ছিল না। তবে বর্তমানে গত ৫-৬ বছর থেকে বাগানটির বেশ কিছু স্থায়ী শ্রমিক (প্রায় অর্ধশতাধিক) ফান্ডের আওতায় আসছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

৪.১৪.৪. অবসর ভাতার প্রাপ্যতা

নিয়ম অনুসারে অবসরপ্রাপ্তদের অবসর ভাতা ও পোষ্য হিসেবে রেশন (২ কেজি ৪৪০ গ্রাম) পাওয়ার কথা থাকলেও ১২টি বাগানে অবসর ভাতা দেওয়া হয় না বলে তথ্য পাওয়া যায়।

সারণি ৪.২২: অবসর ভাতা না পাওয়ার কারণ (শতকরা)

কারণসমূহ	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	সার্বিক
নিজ থেকে অবসর নিয়েছে	৩৯.২	৩৯.০	৩৯.১
অসুস্থতার কারণে বয়স থাকতেই অবসর নিয়েছে	১১.৮	১১.৯	১১.৮
পরিবারের অন্য সদস্যকে বদলি দেওয়ার কারণে	১০.৮	৫.১	৮.৭
এই বাগানে অবসর ভাতা দেয় না	৫.৯	৬.৮	৬.২
বাবুদের অবহেলা	২.০	৫.১	৩.১
তখন নিয়ম ছিল না	২.৯	১.৭	২.৫
ফান্ড পাওয়ার পর ভাতা পাবে	১.০	১.৭	১.২
অপরিচিতদের অবসর ভাতা দেয় না	২.০	০.০	১.২
বর্তমানে দেয় না, আগে দিতো	১.০	১.৭	১.২
অন্যান্য	১.০	১.৭	১.২
জানি না	২২.৫	২৫.৪	২৩.৬

আবার জরিপে দেখা গেছে ৪৮.৫% অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক অবসর ভাতা পায় না। অবসর ভাতা না পাওয়ার ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের (৫১.৩%) হার মূল বাগানের (৪৭.০%) তুলনায় বেশি। কোনো শ্রমিক একটানা ১৫ বছর স্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরে নিজ থেকে অবসরে গেলেও অবসর ভাতা পাওয়ার নিয়ম থাকলেও ৩৯.১% নিজ থেকে অবসর নিয়েছেন বলে অবসর ভাতা পায় না, ১১.৮% অসুস্থতার কারণে বয়স থাকতেই অবসরে গিয়েছিল বলে অবসর ভাতা পাচ্ছে না। অথচ এই শ্রমিকরা ১৫ বছরের অনেক বেশি সময় স্থায়ী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আবার ৮.৭% বদলি কাজ ছেলে বা বউকে দেওয়া, ৬.২% বাগানে অবসর ভাতা না দেওয়া, ৩.১% কর্মকর্তা বা বাবুদের দায়িত্বে অবহেলা, ২.৫% তখন নিয়ম না থাকা ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করেন। তবে ২৩.৬% শ্রমিক জানে না যে কেন তাদের অবসর ভাতা দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ শ্রমিক তাদের পুরোপুরি প্রাপ্য সম্পর্কে জানে না বা সচেতন নয়। প্রায় সবগুলো বাগানে শ্রমিকরা জানে যে কোনো শ্রমিক স্বেচ্ছায় বা অসুস্থতার কারণে অবসর নিলে তাদের রেশন বা অবসর ভাতার কোনোটিই দেয় না। তাদেরকে কর্তৃপক্ষ থেকে এরকম জানানো হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে এ ধরনের চর্চা কর্তৃপক্ষ থেকে করে আসছে। অনেক বাগানে স্বেচ্ছায় বা অসুস্থতার কারণে অক্ষম হয়ে গেলে যদি কাজ থেকে অবসর নেয় তাহলে

তাকে বাগান থেকে অবসরকালীন কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। ১৫-২০ বছর কাজ করে অসুস্থতা বা অন্য কারণে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছে এমন অনেক শ্রমিক অবসর ভাতা কিংবা পোষ্য হিসেবে রেশন পায় না। একজন পুরুষ শ্রমিক ২০ বছরের উপরে কাজ করেছেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে ২ বছর আগে অবসর নিয়েছেন এবং পরিবারের অন্য কাউকে বদলি হিসেবে কাজ দিয়েছেন বলে তিনি অবসর ভাতা পান না। এমনকি পোষ্য হিসেবে রেশনও তাকে দেওয়া হয় না। আর ফান্ডের টাকাও অনেক কম পেয়েছে, মাত্র ২৩০০০ টাকা।

৪.১৫. বিনোদন ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ {তফসিল-৫ এর ৩নং এ (ক), (খ) ও (গ)} অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে বিনোদন কেন্দ্রের ব্যবস্থা বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করতে হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মাত্র ৩১টি বাগানে বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে। তবে এই বিনোদন কেন্দ্র বলতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি একটি নাচ ঘর, যা মূলত পূজা মণ্ডপ হিসেবে বা কীর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। টিনের চাল বিশিষ্ট কোনো বেষ্টনী ছাড়া এ নাচ ঘরে আগে মূলত বিভিন্ন পূজা পার্বণে যাত্রাপালার আয়োজন করা হত। বর্তমানে দু-একটি বাগানে সেটা চালু থাকলেও বেশিরভাগ বাগানে সে ব্যবস্থা নেই। এসব নাচ ঘরে কোনো অভ্যন্তরীণ বিনোদনের সরঞ্জাম নেই। তবে ৯টি বাগানের নাচঘরে ক্যারাম বোর্ড ও টিভি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। ৪৮টি বাগানে খেলার মাঠ রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ২৭টি বাগানে কিছু কিছু বহিস্থ বিনোদন ব্যবস্থা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। কয়েকটি বাগানে ১৬ই ডিসেম্বর ও ২৬শে মার্চ (বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস) উৎযাপনের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ অল্প কিছু অর্থ দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ীদের বাগান কর্তৃপক্ষ পুরস্কার হিসেবে সস্তা বাটি ও গ্লাস বা অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করে থাকেন। কোনো কোনো বাগানে কিছু কিছু বাড়িতে টেলিভিশন আছে এবং এসব পরিবার তার নিজ নিজ খরচে বাড়িতে টেলিভিশন কিনে নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

সারণি ৪.২৩: বিভিন্ন বিনোদন ব্যবস্থা

সুবিধাদি	বাগান সংখ্যা		
	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	মোট
বিনোদন কেন্দ্র ব্যবস্থা আছে	২০	১১	৩১
অভ্যন্তরীণ বিনোদন ব্যবস্থা আছে	৯	০	৯
বহিস্থঃ বিনোদন ব্যবস্থা আছে	১৬	১১	২৭
খেলার মাঠ আছে	৩৪	১৪	৪৮

৪.১৬ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

বক্স ৪.৭: চা বাগানের কারখানার তিন জন শ্রমিকের কথা

একটি চা ফ্যাক্টরিতে চা পাতা কাটা মেশিন (সিটিসি) চলন্ত অবস্থায় পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকের হাত কাটা পরে এবং মেশিনের ভিতরে চলে যায়। কিন্তু পাঁচ মাস হয়ে গেলেও তার এই অঙ্গহানির জন্য আইনে উল্লিখিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়নি। এই শ্রমিক লেবার হাউজে শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে তার সমস্যার কথা জানালে তারা কর্তৃপক্ষের সাথে তা নিয়ে আলোচনা করে তার ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

একইভাবে আরেকটি বাগানের একজন শ্রমিকের কারখানায় কাজ করতে গিয়ে হাতের আঙ্গুল কেটে পড়ে যায় যা আর জোড়া লাগানো সম্ভব হয়নি। এই শ্রমিককেও কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

একজন নারী শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চোখটি নষ্ট হলেও তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি

শ্রম আইনের ১৫০নং ধারায় (১) উপধারায় শ্রমিকদের চাকুরি চলাকালে উহা থেকে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে যদি কোনো শ্রমিক শরীরে জখমপ্রাপ্ত হন বা মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।[৮৩] কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, চা বাগানের শ্রমিকদের এ ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। চা বাগানের কারখানায় বিভিন্ন ধরনের মেশিনের মাধ্যমে চা পাতা প্রসেস করা হয় এবং এখানে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে। এসব শ্রমিকের কর্মরত অবস্থায় কোনো ক্ষতি হলে বেশিরভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ তা নিজ থেকে দিতে চায় না। কখনও কখনও ক্ষতিপূরণ হিসেবে সামান্য অর্থ প্রদান করে থাকে যা আইনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের তুলনায় খুবই কম। কখনও কখনও ক্ষতির পরিমাণ বেশি হলে কর্তৃপক্ষ ক্ষতির পরিমাণ কম দেখাতে চায়, অর্থাৎ কারো স্থায়ীভাবে শরীরের ক্ষতি হলেও তা অস্থায়ী ক্ষতি

[৮৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, দ্বাদশ অধ্যায়

হিসেবে দেখানোর প্রবণতা কর্তৃপক্ষ থেকে দেখা যায়। কখনও কখনও শ্রমিকরা ইউনিয়নের সহায়তা নিয়ে থাকে। শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের ওপরে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে কখনও কখনও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়ে দেয়। তবে তা বেশির ভাগ সময়ে আইনে উল্লিখিত অর্থের চেয়ে কম হয়ে থাকে।

৪.১৭ শিশুসদন

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ {তফসিল-৫ এর ৫নং এ (ক), (খ), (গ) ও (ঘ)} অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য শিশু সদন, শিশুদের দেখাশোনার জন্য একজন মহিলা, বাচ্চাদের জন্য দুধ বা নাস্তা এবং উপযুক্ত খেলনা ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করার নিয়ম থাকলেও ৬৪টি বাগানের মধ্যে মাত্র ৭টিতে এই শিশু সদন রয়েছে এবং ১০টিতে ব্রিটিশ আমলের জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে কিন্তু কোনো কার্যক্রম নাই। আর ৪৭টিতে কোনো শিশুসদন নাই। অর্থাৎ ৫৭টি বাগানে শিশুসদনের কোনো কার্যক্রম নাই। তথ্যদাতাদের মতে ২০ থেকে ৩০ বছর আগে শিশুসদন চালু থাকলেও এখন আর তা নাই। যেসব বাগানে শিশুসদন চালু রয়েছে তার মধ্যে শৌচাগার রয়েছে ২টিতে, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে ৬টিতে, দুধ ও নাস্তা দেওয়া হয় ৬টিতে, খেলনা রয়েছে ৪টিতে। দুই একটি বাগানে শিশুসদনের কার্যক্রম না থাকায় বাগানের ডিসপেনসারি বা কম্পাউন্ডারের বসার এবং ঔষধ পত্র প্রদান করার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনোটিতে বাচ্চাদের দেখাশোনা করার মতো কোনো লোক নেই। কোনো কোনো বাগানে বাচ্চাদের মাঝে মাঝে খিচুরি দেওয়া হয়। কোনো কোনো বাগানে সেকশনে বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মহিলা আছে, কোনো নাস্তা ব দুধের ব্যবস্থা নাই। একটি বাগানের শিশুসদনের ঘরটি একটি বেসরকারি সংস্থাকে (এনজিও) ব্যবহারের জন্যে দিয়েছেন। নারী শ্রমিকদের বাড়িতে বাচ্চা দেখার কেউ না থাকার কারণে তারা কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কিংবা দীর্ঘ সময় কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এমন অনেক নারী শ্রমিক রয়েছে যারা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য দীর্ঘসময় কাজে যেতে পারেনি বলে তাদের স্থায়ী শ্রমিক থেকে অস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে।

বক্স ৪.৮: শিশু সদন সম্পর্কে শ্রমিকদের ভাষ্য

ব্রিটিশ আমলে শিশু সদন ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে শিশু সদনের ঘরগুলো ভেঙ্গে পরেছে। এখানে বাচ্চাদের জন্য কোনো খেলনা নাই, পানির ব্যবস্থা নাই, দেখাশোনার জন্য লোক নাই, যে দুধ দেয় তার মান ভাল নয়। এ জন্য কেউ বাচ্চা রাখে না, যে যার মতন বাড়িতে বাচ্চাদের রেখে যায় এবং পরিবারের অন্য কেউ তাদের দেখাশোনা করে।

৪.১৮ বাগানে পৌঁছানো ও ভিতরের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বেশির ভাগ চা বাগানের অবস্থান প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় এবং সমতল এলাকা থেকে অনেক দূরে হওয়ায় এর যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রেই ভাল নয়। কোনো কোনো বাগানে পৌঁছানো খুবই কষ্টকর। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৩৯টি বাগানে পৌঁছানোর রাস্তা ভাল, ৮টি বাগানে পৌছানোর রাস্তা মোটামুটি, ১৭টি বাগানে পৌঁছানোর রাস্তা খুবই খারাপ।

আবার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শ্রমিকদের কলোনি বা বাড়ি-ঘরের ভিতরকার বেশির ভাগ বাগানের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই নাঁজুক। ২৫টি বাগানের ভিতরে প্রকৃত অর্থে কোনো রাস্তা নাই। এসব বাগানের ঘরগুলো টিলার ওপরে অবস্থিত। এখানে এক টিলা থেকে আরেক টিলায় যেতে কখনও কখনও পানিও পার হতে হয়। ১৭টি বাগানে কিছু পাকা রাস্তা ও কিছু কাঁচা রাস্তা দেখা যায়। ১৫টি বাগানের রাস্তা কাঁচা এবং বর্ষায় কাদা হয়। তবে ৭টি বাগানের ভিতরের রাস্তা পাকা বলে তথ্য পাওয়া যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা গেছে মূল বাগান থেকে ফাড়ি বাগানের অবস্থা বেশি খারাপ। টিলা পার হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের সংখ্যা বেশি দেখা যাচ্ছে ।

সারণি ৪.২৪: বাগানের ভিতরকার রাস্তার অবস্থা

যোগাযোগ ব্যবস্থা	বাগানের সংখ্যা		
	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	মোট
পাকা রাস্তা	৫টি	২টি	৭টি
কিছু কাঁচা, কিছু পাকা	১৫টি	২টি	১৭টি
কাঁচা রাস্তা, বর্ষায় কাদা হয়	৮টি	৭টি	১৫টি
খুবই কষ্টকর (টিলা, কাদা, অনেক হাটতে হয়)	১৩টি	১২টি	২৫টি

৪.১৯ অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী শ্রমিকরা সঠিকভাবে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না পেলে কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে তা শাখা সভাপতি বা পঞ্চায়েত/সার্কেল সভাপতি বা ভ্যালি সভাপতি সংশ্লিষ্ট বাগানের ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় স্থানীয়

ইউনিয়ন পরিষদ তা সমাধানের চেষ্টা করবে।[৮৪] অভিযোগ করার বা নিরসনের জন্য কোনো লিখিত বা সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত ব্যবস্থা বাগানগুলোতে নেই। তবে বেশিরভাগ বাগানে কোনো সমস্যা হলে বা শ্রমিকদের কোনো অভিযোগ থাকলে শ্রমিকগন মৌখিকভাবে পঞ্চায়েতকে জানায়, পঞ্চায়েত বাবুকে জানায়,

বাবু ম্যানেজারকে জানায়। আবার কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সরাসরি ম্যানেজারকে জানায় এবং যতটুকু সম্ভব পঞ্চায়েত, বাবু, ম্যানেজার এবং অনেক ক্ষেত্রে বাগান সংলগ্ন স্থানীয় ইউপি সদস্য বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকেন। অনেক সময় অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ভ্যালির সভাপতিও আসেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ করেও কোনো লাভ হয় না বা পঞ্চায়েত ও বাবুরা অভিযোগ আমলে নেয় না।

বক্স ৪.৯: পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগ
'কিছু পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সদস্য আছে যারা কর্তৃপক্ষের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। ফলে তারা সাধারণ শ্রমিকদের অভিযোগ আমলে নিতে চায় না।'
- দলীয় আলোচনায় শ্রমিকদের মতামত

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় ৯৭.৯% তথ্যদাতা বলেছে, অভিযোগের গুরুত্ব এবং কর্তৃপক্ষের কাছে সাধারণ শ্রমিকদের অভিগম্যতার উপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েত, বাগানের বাবু বা ব্যবস্থাপনা দল, ভ্যালির সভাপতি, শ্রমিক ইউনিয়নের লোক এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে ১৯.২% শ্রমিক পারিবারিক বিষয়, ঘর মেরামত, চিকিৎসাকেন্দ্র সংক্রান্ত, রেশন, বিদ্যুৎ, পানি, শৌচাগারের সমস্যাসহ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করেছে।[৮৫] অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে মূল বাগানের (১৮.৬%) তুলনায় ফাড়ি বাগানের (২১.৪%) হার কিছুটা বেশি।

চিত্র ৪.২৩: অভিযোগ নিষ্পত্তির হার

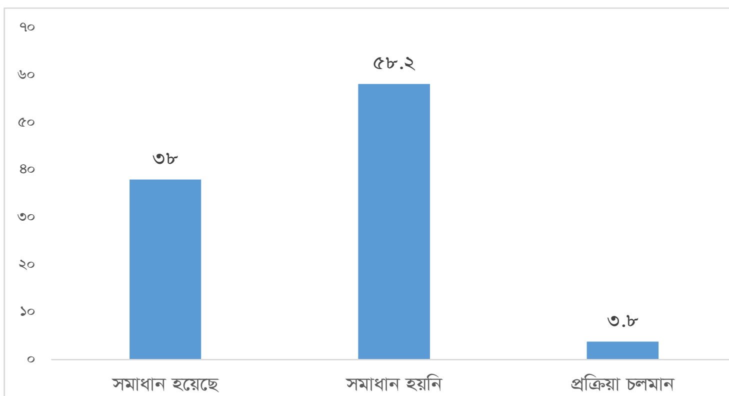

যে সকল তথ্যদাতা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেছে, তার মধ্যে মাত্র ৩৮% অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, অর্ধেক (৫৮.২%) অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি ও ৩.৮% ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভিযোগ নিষ্পত্তির হার বাগানগুলোতে অনেক কম। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিযোগ করে উল্টো শাস্তি পেতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাতার ওজনে কম দেখানোর বিষয়ে অভিযোগ করার পর অভিযোগকারীকে শাস্তিস্বরূপ নম্বরের সব থেকে দূরবর্তী স্থানে কাজে পাঠানো হয় ও বিভিন্ন অজুহাতে বকাঝকা করা হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা অভিযোগ করতে উৎসাহ বোধ করে না।

৪.২০ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত-সুযোগ সুবিধা

দেশের বঞ্চিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী হিসেবে চা শ্রমিকরাও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জরিপের তথ্য মতে, ১১.৮% পরিবারের সদস্য কোনো না কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বয়স্ক ভাতা (৭৩.৯%) ও বিধবা ভাতা (১১.৯%)[৮৬]। ব্যাংকের মাধ্যমে এসব ভাতার টাকা দেওয়া হয় বলে তা প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হয় না। তবে তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য অনেককেই কষ্ট করতে হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানের সাথে যাদের সম্পর্ক ভালো তারা এইসব কর্মসূচিতে সহজেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

[৮৪] Memorandum of Labour Agreement, 01.01.2015 to 31.12.2016

[৮৫] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ১০ দেখুন

[৮৬] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ১১ দেখুন

চিত্র ৪.২৪: সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির হার

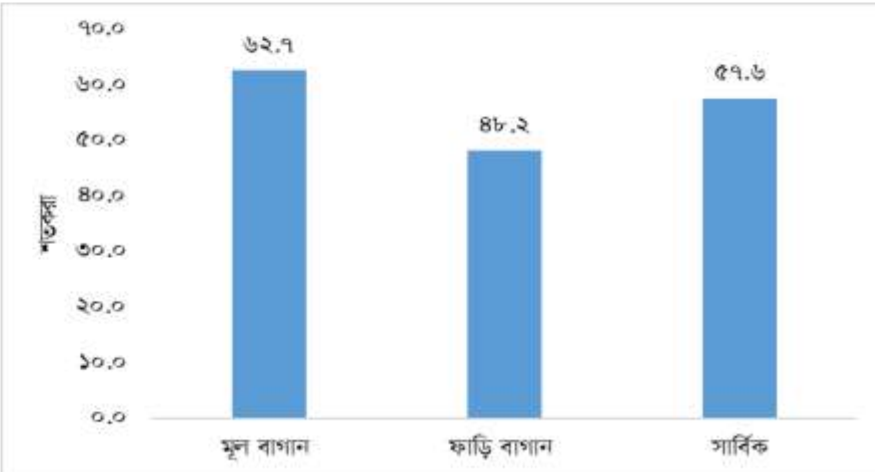

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন *চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন* নামক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৫ হাজার টাকা সমমূল্যের খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রী বিতরণের যে প্রকল্প রয়েছে, তার আওতায় ৫৭.৬% তথ্যদাতা অন্তভূক্ত হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ফাড়ি বাগানের (৪৮.২%) তুলনায় মূল বাগানে (৬২.৭%) হার বেশি। যে সকল শ্রমিক এই সুবিধা পেয়েছেন, তাদের মতে বিতরণকৃত খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রীর মান খুব খারাপ ছিল এবং যে পরিমাণ দ্রব্যাদি দেওয়ার কথা ছিল তার থেকে কম দেওয়া হয়েছে। এসব দ্রব্যের মূল্য পাঁচ হাজার টাকা বলা হলেও এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ৩ হাজার টাকার বেশি হবে না বলে তথ্যদাতাদের অভিমত। তাছাড়া নিম্নমানের চাল, পঁচা আলু, পামঅয়েল ও পলেস্টারের লুঙ্গি দেওয়া হয়েছে। চাল ৫০ কেজি দেওয়ার কথা থাকলেও তারা ৩০ কেজি পেয়েছে বলে গবেষণায় তথ্য উঠে এসেছে। ইউপি সদস্য তার কাছের লোকদের বা আত্মীয়-স্বজনদের বার বার এসব সুবিধা দিয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃত গরিবরা এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। একজন শ্রমিক এসব সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করেন, 'যারা পায় তারাই বার বার পায়, আর যারা পায় না তারা কোনো সময়ই পায় না।'

৪.২১ মৃত শ্রমিকের সৎকার্যে কর্তৃপক্ষের সহায়তা

কোনো শ্রমিক মারা গেলে বাগান থেকে জ্বালানি কাঠ আর চা পাতা দেওয়া হয়। অনেক সময় এই কাঠ পেতেও অনেক হয়রানির শিকার হতে হয় বলে শ্রমিকরা জানান। বাকি সব খরচ মৃত শ্রমিকের আত্মীয়-স্বজনরা ব্যবস্থা করে থাকে। অনেক সময় চা শ্রমিকরা সবাই তাদের বেতন থেকে চাঁদা তুলে মৃত শ্রমিকের সৎকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। মৃত শ্রমিকের সৎকার্যে বাগান কর্তৃপক্ষ কোনো টাকা পয়সা বা অনুদান দেয় না। প্রায় প্রতিটি বাগানেই এ চিত্র একইরকম।

৪.২২ শ্রমিক নির্যাতন

ব্রিটিশ আমল থেকে বাগানগুলোতে শ্রমিকদের শারীরিকভাবে নির্যাতনের অনেক ঘটনার কথা শোনা যেত। তবে বর্তমানে অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এবং বাগানগুলোতে এমন শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা নেই বললেই চলে। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন কিছু বাগানে স্থানীয় মাস্তানদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে তথ্যদাতারা জানান। এই মাস্তানদের বেশি টাকায় নিয়োগ দেওয়া হয়, যাদের কাজ শ্রমিক অসন্তোষ দমন করা। কোনো শ্রমিক তার অধিকার আদায়ে দাবি উত্থাপন করলে এই মাস্তান শ্রমিকরা ওই শ্রমিককে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে থাকে। তবে এ ধরনের চিত্র স্থানীয় প্রভাবশালী বাগান মালিকের বাগানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে তথ্য পাওয়া যায়।

গবেষণায় নারী শ্রমিকরা কোনো ধরনের শারীরিক বা যৌন হয়রানিমূলক আচরণের শিকার হন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ১% (১৭) জন উত্তরদাতা জানান যে নারী শ্রমিকদের সাথে বাবুরা খারাপ ব্যবহার করে, খারাপ ভাষায় কথা বলে, এলাকার অন্যান্য পুরুষ শ্রমিকরা যৌন নির্যাতন করে, তাদের বিভিন্নভাবে বিরক্ত করে ও স্বামী নির্যাতন করে। তবে তিনজন শ্রমিক জানান যে তারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনকে যিনি নির্যাতন করেছেন তার সাথে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে বিভিন্ন সময়ে নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলেও সামাজিক অবস্থা ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা প্রকাশ করা হয় না। তবে পূর্বে এ ধরনের নির্যাতন হলেও বর্তমানে তা কমে এসেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

৪.২৩ শ্রমিকদের সাথে অবমাননাকর আচরণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় বাগানের ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারগণ শ্রমিকদের সাথে অবমাননাকর আচরণ করে থাকে। বাগানের ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজারের সামনে কোনো শ্রমিক বা পঞ্চায়েত সভাপতি কখনও চেয়ারে বসতে পারে না। কিছু কিছু বাগানে বর্তমান সময়েও ব্রিটিশ আমলের ন্যায় ম্যানেজারদের জুতা পড়ানো ও খোলার কাজ শ্রমিকরা করে থাকে। এসব কর্মকর্তাগণ শ্রমিকদের সাথে তুই তোকারি করে কথা বলেন এবং তাদের সামনে শ্রমিকরা কখনই টুপি পড়তে পারে না। এসব কর্মকর্তাগণ শ্রমিকদের সাথে শ্রম দাসদের ন্যায় আচরণ করেন। সাম্প্রতিক একটি বাগানের পঞ্চায়েত সভাপতি ম্যানেজারের সামনে চেয়ারে বসার কারণে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করা হয়, পরের দিন ওই চেয়ার ভেঙ্গে ফেলা হয়।

৪.২৪ শ্রমিকদের মাদকাসক্তি

ব্রিটিশ আমল থেকে প্রায় প্রতিটি বাগানে শ্রমিকদের জন্য মদ সহজলভ্য করে মদ পানের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাতাল করে তাদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন রাখার কৌশল গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও অবসান হয়নি। প্রায় প্রতিটি বাগানে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান (পাট্টা) রয়েছে। এই দোকানকে ঘিরে বাগানে আরো অনেক অবৈধ মদের দোকান গড়ে উঠেছে। বাগান সংলগ্ন বাঙ্গালী, এমন কি বাগানের শ্রমিকরা এসব অবৈধ ও ক্ষতিকর মদের ব্যবসার সাথে জড়িত। পুরুষ শ্রমিকরা তলব পাওয়ার দিনেই তাদের মজুরির একটি বড় অংশ মদ খাওয়ার পিছনে ব্যয় করে। ফলে তাদের যেমন আর্থিক সচ্ছলতা ব্যাহত হয় তেমনি তাদের পরিবারের উপরেও একটি নেতিবাচক প্রভাব পরে। প্রায়ই এসব শ্রমিকরা মাতাল হয়ে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের উপরে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে থাকে। শ্রমিকরা যে অর্থ তাদের মদের পিছনে ব্যয় করে তা তাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করলে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেত। তবে কখনও কখনও বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকরা যাতে বাগানের বাইরে কাজ করতে না যেতে পারে সেজন্য তাদের এই মদ ব্যবসার সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়।

৪.২৫ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বে অবহেলা ও দুর্নীতি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকরা চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে কোনো কার্যক্রম সম্পন্ন করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। নিয়মিত বাগান পরিদর্শনের দায়িত্ব থাকলেও তাদের বেশির ভাগই তা সঠিকভাবে করে না। বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা তাদের অনেকেই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে। তারা প্রতি বছর পরিদর্শনে যাওয়ার আগে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়। বাগানে এসে তারা কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে নিয়ম বহির্ভূত টাকা নিয়ে চলে যায়। সাধারণত প্রতি বাগান থেকে ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা ঘুষ নিয়ে থাকে। কোনো কোনো বাগানে তাদের যেতেও হয় না, তাদের নিকট টাকা পৌঁছে যায়। কখনও কখনও বাগান পরিদর্শনে গেলেও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। এরা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না। এ পর্যন্ত কোনো দিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করেছে বলে তথ্য পাওয়া যায় নি। পরিদর্শনে যাওয়ার আগে বাগান ম্যানেজারদের জানানো হলেও শ্রমিক পক্ষের কাউকে পরিদর্শনে আসার বিষয়টি জানানো হয় না এবং শ্রমিকদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চায় না। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সব সময়ই কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা যে মজুরি পাচ্ছে তা অন্যান্য পেশার শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় নিম্ন। বছরের পর বছর বাগানে কাজ করলেও তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ার জন্য তাদের স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। খাদ্যের জন্য যে রেশন দেয় তা অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় রয়েছে তার পড়ালেখার মান ভাল নয় এবং সেখানকার অবকাঠামোও দেশের অন্যান্য এলাকার স্কুলের তুলনায় খারাপ, শিক্ষকদের মান নিম্ন, তাদের বেতন ভাতাও সীমিত। আবার শ্রমিকদের যেসব বাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে তার আয়তন প্রয়োজনের তুলায় অপর্যাপ্ত, বাড়ির অবকাঠামোর মান খারাপ, মেরামতের প্রয়োজন হলেও তা করা হচ্ছে না। এছাড়া ভবিষ্য তহবিলের টাকা সঠিকভাবে না পাওয়া ও পেতে সময়ক্ষেপণ, অবসর ভাতা না পাওয়া, সঞ্চয়ের টাকা সঠিকভাবে জমা না দেওয়া প্রভৃতি সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের এই বঞ্চিত জীবনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করণে সরকারের যে প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় ভূমিকা রাখার কথা তারা ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে এড়িয়ে যায়। ফলে দীর্ঘ দিন ধরে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে না।

অধ্যায় পাঁচ: প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

ভূমিকা

পূর্বের তুলনায় শ্রমিক বঞ্চিতের সংখ্যা কমলেও এখনও তারা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এই বঞ্চিত হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে ওয়াচডগ বডি হিসেবে ভূমিকা পালন করার কথা তাদের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা বিরাজমান রয়েছে। একই ভাবে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। বর্তমান অধ্যায়ে শ্রমিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১. প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৫.১.১ শ্রম আদালত

চা শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত শ্রম আদালতটি চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় শ্রমিকদের পক্ষে আদালতে গিয়ে অভিযোগ জানানো সম্ভব হয় না। বেশির ভাগ চা বাগান সিলেট বিভাগে অবস্থিত থাকায় চা শ্রমিকরাও সিলেট অঞ্চলই বসবাস করে। তাদের যে পরিমাণ মজুরি দেওয়া হয় সে মজুরি ব্যয় করে চট্টগ্রাম গিয়ে অভিযোগ দাখিল করা প্রায় অসম্ভব। ফলে কখনও কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তাদের অভিযোগ দাখিল করা হয় না। এছাড়া শ্রমিকদের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাতে তাদের পক্ষে অর্থ খরচ করে চট্টগ্রামে গিয়ে অভিযোগ দাখিল ও তা নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শ্রম আদালত সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিকদের তেমন কোনো ধারণাও নেই। শ্রম আদালত যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে সেরকম সচেতনতাও শ্রমিকদের নেই।

৫.১.২ তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপ-শ্রম পরিচালক (ডেপুটি ডিরেক্টর অফ লেবার - ডিডিএল), মৌলভীবাজার ও উপ-মহা পরিদর্শক, শ্রীমঙ্গল কার্যালয়

শ্রমিকদের তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে জনবল সংকট অন্যতম। উপ-শ্রম পরিচালকের কার্যালয়ে ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের মধ্যে মাত্র ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে। ফলে তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সময়ক্ষেপণ হয়। একইভাবে উপ-মহা পরিদর্শক (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল - ডিআইজি) - কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরেও মোট পদের সংখ্যা ১৭টি কর্মরত আছে ১২ জন। জনবলের অভাবে তাদের পক্ষে সকল বাগান পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না।

আবার বেশিরভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাবান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের খুব কাছাকাছি থাকায় তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাগণ তাদের চাপে সঠিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে ভয় পায়। তারা চাইলেও পরিদর্শনে যেতে পারে না। কখনও বাগান পরিদর্শন করে সঠিক প্রতিবেদন দিতে চাইলেও বাগান কর্তৃপক্ষের চাপে তা তুলে ধরতে পারেন না। উদাহরণ রয়েছে যে, ডিআইজি কার্যালয়ের একজন পরিদর্শকগণ বাগান পরিদর্শনে গিয়ে অনিয়ম চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিঠি ইস্যু করায় বাগান কর্তৃপক্ষ উল্টো পরিদর্শককে হুমকি দেয় এবং মন্ত্রণালয় থেকে ফোন করে মামলা না করার জন্য সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। এছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের এই কার্যালয়ে পদায়ণ করা হয়।

৫.১.৩ ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়

ভবিষ্য তহবিল পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে যার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃপক্ষ পক্ষের ৩ জন সদস্য, শ্রমিক পক্ষের ৩ জন যাদের মধ্যে ২ জন শ্রমিক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ও ১ জন কর্মকর্তাদের অংশ ও ২ জন নিরপেক্ষ সদস্য দ্বারা গঠিত হয়। এই নিরপেক্ষ সদস্য দুইজন সরকার পক্ষ থেকে বাছাই করা হয়। সাধারণত কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা বা দর কষাকষি হলে অধিকাংশের ভোটের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষের ৩ জন এবং শ্রমিক পক্ষের যিনি কর্মকর্তাদের ভিতর থেকে নিযুক্ত হন তারা প্রায়ই একই পক্ষ সমর্থন করেন। এছাড়া যে দুইজন নিরপেক্ষ সদস্য থাকেন তারা কোনো পক্ষই সমর্থন করেন না বা চুপ থাকেন। ফলে বেশির ভাগ সময় বাগান কর্তৃপক্ষের দিকে ভোট বেশি হওয়ায় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা হয় না।

৫.২ বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন

৫.২.১. চা-শ্রমিক ইউনিয়নের দর কষাকষিতে সক্ষমতার ঘাটতি

নিয়মানুযায়ী ২ বছর পর পর বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন হওয়ার কথা। সরকারের পক্ষ থেকে উপ-পরিচালক, শ্রম কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে এই নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচন সময় মত সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। গত দুটি নির্বাচন মোটামুটি সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়। তবে পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বেশকিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনের খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করত, এবং হাত উঁচিয়ে সমর্থনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করা হত। যেখানে প্রভাবশালী একটি গ্রুপ তাদের নিজেদের এবং বাগান কর্তৃপক্ষের পছন্দ মতো করে নেতা নির্বাচন করত। ফলে পরবর্তীতে দ্বিপক্ষীয় চুক্তিসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সাথে দর কষাকষিতে নেতারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত না।

অনেক ক্ষেত্রেই চা শ্রমিকের অধিকার আদায়ে শ্রমিক ইউনিয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সফল হয় না, কারণ শ্রমিক নেতাদের বেশিরভাগ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালাসহ শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। তাদের মধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চা বাগান কর্তৃপক্ষের মত প্রভাবশালীদের সাথে দর কষাকষির জন্য যে সক্ষমতার প্রয়োজন তার ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দীর্ঘ দিন থেকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় করার অনুরোধ করলেও, সম্প্রতি তা করা হয়েছে। আবার দর কষাকষির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি করতে অনেক বার বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিক পক্ষের সভা করতে হয়। এই সভাগুলো ঢাকাতে বাগান কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে শ্রমিক পক্ষের ১০/১২ জনের একটি দলকে বারবার ঢাকাতে যেতে হয়, যেটা খুবই ব্যয়বহুল এবং এই ব্যয় সাধারণ শ্রমিকের চাঁদার টাকা দিয়ে সংকুলান করতে হয়। সর্বশেষ চুক্তিটি সম্পন্ন করার জন্য ইউনিয়নের সদস্যদের ২২ বার ঢাকায় আসতে হয়েছে। অথচ চা শ্রমিক ইউনিয়ন মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত এবং শ্রমিক নেতারাও এই অঞ্চলে বসবাস করে। শ্রমিক নেতারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেও তারা তা মানছে না। আবার চুক্তি স্বাক্ষরে দীর্ঘসূত্রিতার অবসান করার অনুরোধ করেও কোনো ফল পাননি শ্রমিক ইউনিয়ন, কর্তৃপক্ষ সময়ক্ষেপণ করে। জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত যে চুক্তি হওয়ার কথা, তা স্বাক্ষরিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে। জানুয়ারি ২০১৭ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ এর বেতন নিয়ে যে সমঝোতা চুক্তি হালনাগাদ হওয়ার কথা তা স্বাক্ষরিত হয় অক্টোবর ২০১৮ সালে। এভাবে সমঝোতা চুক্তিটি দীর্ঘ দিন পরে সম্পন্ন হওয়ায় দীর্ঘ সময়ের মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদির টাকা এরিয়ার হিসেবে জমা হয়ে যায়, যা দুর্বল বাগানের পক্ষে এক সাথে জমা দেওয়া কঠিন হয়ে পরে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সভায় বাগান মালিকগণ নিজের অংশগ্রহণ না করে তাদের বেতনভুক্ত কর্মকর্তাদের পাঠান সভা করার জন্য। ফলে এসব কর্মকর্তা সভায় কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। সভার প্রস্তাবনা নিয়ে কর্মকর্তারা বার বার বাগান মালিকদের সাথে আলোচনা করে। এভাবে চুক্তি স্বাক্ষরে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। একইভাবে চুক্তি চুড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কখনও কখনও শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ায়ও চুক্তি স্বাক্ষরে দেরি হয়ে থাকে।

৫.২.২. শ্রমিক নেতাদের কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করা

আগে যখন হাত উঁচিয়ে ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব নির্বাচন করা হত, তখন বাগান কর্তৃপক্ষ সমর্থিত এক নেতা ৩৬ বছর বিনা নির্বাচনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সেই নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই বাগান কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে চলত বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে বর্তমানে নির্বাচিত অনেক শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধেও কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করার তথ্য পাওয়া গেছে। বিশেষ করে কোনো কোনো পঞ্চায়েত কমিটির নেতারা সরাসরি বাগান কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে বলে তথ্যদাতারা জানান। বাগান কর্তৃপক্ষ এসব নেতাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিজেদের পক্ষে কাজ করানোর জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখেন। ফলে তারা শ্রমিকদের স্বার্থের চেয়ে কর্তৃপক্ষের স্বার্থে কাজ করে।

৫.৪. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ

গবেষণায় দেখা গেছে, চা বাগানের শ্রমিকদের বাগানে কিংবা চা কারখানায় কাজ করার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না। বিশেষ করে যেসব শ্রমিক চা কারখানায় কাজ করে তাদের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি চালিয়ে কাজ করতে হয়। এসব যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ ছাড়া কাজ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে।

৫.৫. নারী সর্দার নিয়োগ

বিভিন্ন বাগান থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে পুরুষ সর্দার নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও নারী সর্দার নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। বর্তমানে দু একটি বাগানে নারী সর্দার নিয়োগ করা হলেও বেশিরভাগ বাগানে নারী সর্দার নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। যেহেতু চা বাগানে বেশিরভাগ শ্রমিক নারী এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় যা অনেক সময়ই পুরুষ সর্দারকে বলা সম্ভব হয় না। কখনও কখনও এই নারী শ্রমিকদের শরীরের সমস্যার কারণে তারা ছুটি বা অন্যান্য সুযোগ দাবি করার ক্ষেত্রে লজ্জার কারণে পুরুষ সর্দারকে জানাতে পারে না। ফলে তা যৌক্তিক হলেও তারা তা ভোগ করতে পারে না।

৫.৬. তথ্য না জানা

বেশির ভাগ শ্রমিকই তাদের সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্ট আইন বা নীতিমালা সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। তারা বেশির ভাগ অশিক্ষিত হওয়ায় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানার সুযোগও পায় না। ফলে তাদের অনেক সময় বঞ্চনার শিকার হতে হয়। যেমন - ভবিষ্য তহবিলে কত টাকা জমা হচ্ছে, কত টাকা তাদের দেওয়া হবে, টাকা সঠিকভাবে জমা হচ্ছে কিনা, চিকিৎসা সেবা পাবার ক্ষেত্রে কি কি তাদের প্রাপ্য, শ্রমিক ইউনিয়ন কি কাজ করে, কীভাবে করে, কি কি করা প্রয়োজন, তারা সঠিকভাবে দর কষাকষি করতে পারছে কিনা ইত্যাদি বিষয় তারা সঠিকভাবে জানে না। এজন্য বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে। আবার কোনো কোনো সময়ে শ্রমিকদের না জানিয়ে চা পাতার ওজন কম দেয়। এভাবে শ্রমিকরা বিভিন্ন প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বক্স ৫.১: তথ্য না জানা বিষয়ক একজন শ্রমিকের ভাষ্য
‘কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো লভ্যাংশ দেয় না, সব সময় বাগান লসে থাকে বলে আমাদের বলে। সত্য মিথ্যা জানার কোনো ব্যবস্থা আমাদের নাই।’ - একজন শ্রমিকের কথা

৫.৭. চা বাগান এলাকায় নলকূপ বসানোয় সমস্যা

চা বাগানগুলো যে এলাকায় অবস্থিত সেসব এলাকার গভীর নলকূপ বসানো কঠিন। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই চা বাগানগুলো উঁচু এলাকায় অবস্থিত গভীর নলকূপ বসালেও অনেক সময় পানির স্তর সঠিকভাবে না পাওয়ায় তা বসানো সম্ভব হয় না। আবার হাত কল বসালেও শুষ্ক মৌসুমে পানি পাওয়া যায় না। ফলে চা বাগানগুলোতে পানি সংকট লেগেই থাকে।

৫.৮. সরকারি বরাদ্দ ব্যয়ে চ্যালেঞ্জ

চা বাগানের উন্নয়নের জন্য ৯৬৭ কোটি টাকা বাজেট ব্যয়ে “চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা” করার কথা থাকলেও তার কার্যক্রম প্রত্যাশিত মাত্রায় এখনও শুরু হয়নি। সরকার চা বাগান মালিকদের কিছু সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাগানের শ্রমিকদের কিছু কিছু সুবিধা নিশ্চিত করলেও সরকারি অর্থ ব্যয়ে এখনও তেমন কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না। ফলে চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল হতে পারছে না।

৫.৯ শ্রমিকদের বাড়ির গাছ ব্যবহারের অধিকার

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে শ্রমিকদের বাড়ি বা তার আশে-পাশের গাছ নিজেদের প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করতে পারে না। এজন্য বাগান মালিকের অনুমতি নিতে হয়। কখনও কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। কখনও কখনও গাছ কাটা বা ব্যবহারের জন্য শ্রমিকদের অনুমতিই দেওয়া হয় না। ফলে শ্রমিকরা বাধ্য হয়েই গাছ চুরি করে কেটে নেয়।

বক্স ৫.২: গাছ কাটা বিষয়ে একজন শ্রমিকের ভাষ্য
গাছ কাটা অত্যন্ত ঝামেলার বিষয়। এর জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার হয়। কর্তৃপক্ষ গরু পালার জন্যে অনেক শ্রমিককে বাগান থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। অনেককে গরু পালার জন্য বাগান থেকে বের করে দিয়েছে। যেখানে আমাদেরকে গরু পালতেই দেয় না সেখানে গাছ কাটার অনুমতি তো দুরের কথা। যেকোনো সময় আমাদের বাগান থেকে চলে যেতে হতে পারে। এরকম অবস্থায় বসত বাড়ি থেকে কোনো গাছ কাটার প্রশ্নই আসে না।

বেশিরভাগ সময় কর্তৃপক্ষই এই গাছ কেটে নেয় বা ব্যবহার করে। শ্রমিকরা তা ভোগ করতে পারে না। কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, যেহেতু জমির মালিক সরকার সেহেতু উক্ত জমিতে যে গাছ রোপণ করা হবে বা গাছ বড় হবে সেগুলো সরকারের সম্পদ। সুতরাং উক্ত গাছ কাটতে হলে সরকারেরই অনুমতি নিতে হবে। গাছ কাটার ক্ষেত্রে বন আইন অনুসরণ করার নিয়ম রয়েছে। তা অনুসরণ করেই সরকারকে গাছ কাটার অনুমতি দিতে হয়। আর উক্ত অনুমতি পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারের নিকট থেকে অনুমতি পাওয়া যায় না বলে

বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের গাছ কাটার অনুমতি দেয় না। অথচ শ্রমিকদের বাড়ির গাছ কাটার অধিকার শ্রমিকদেরই থাকা উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, শ্রমিকদের শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরির নিরাপত্তা, ভবিষ্য তহবিল, ছুটি, বাসস্থান প্রভৃতি সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি সংগঠনগুলোর ওপরে উপর মহলের প্রভাব বিস্তার, জনবল সংকটসহ বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে তারা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না যার প্রভাব পরছে চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ওপরে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চিত হচ্ছে না তাদের ন্যুনতম অধিকার। অন্যদিকে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সচেতনতার ঘাটতি ও ভিতরকার কোন্দলের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তারা দাবি উত্থাপনে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সফল হচ্ছে না।

বক্স ৫.৩: শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বিষয়ে একজন মুখ্য তথ্যদাতার ভাষ্য

চা শ্রমিকরা অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করে। মোটা ভাত আর দুটো রুটি খেয়ে এক ঘরের মধ্যে পরিবারের সবাই এক সঙ্গে বসবাস করে। আর এই শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দিতে গিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করে। চিকিৎসা সেবা, পাতার ওজনের ক্ষেত্রে কাঁটায়, ঘরবাড়ি তৈরি বা মেরামত, রেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ঠকানোর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অধিক লাভের আশায় কাপঝাপ ব্যবস্থা চালু রেখেছে। আর কর্তৃপক্ষ যা পছন্দ করে সাহেব (ম্যানেজার), বাবু (স্টাফ) সবাই তাকে খুশি করতে শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করে। ব্যতিক্রম হলে সাথে সাথে চাকরি চলে যায়। সত্যি কথা বলতে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বিষয়ে তেমন একটা ভাবে না।

অধ্যায় ছয়: উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১. উপসংহার

চা বাগান শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসলেও বর্তমান সময়ে এই চিত্রের কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন পূর্বের তুলনায় ছেলে-মেয়েরা বেশি পড়ালেখা করে এবং শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, রেশনের মান ভাল হয়েছে, মাতৃত্বকালীন ছুটি ৩ মাসের জায়গায় ৪ মাস করা হয়েছে, মজুরি ও সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে, ছুটির দিনের বেতন দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি। যেসব চা বাগানগুলোর মালিকানা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সেসব চা বাগানের শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক নিয়ম-কানুনগুলো তুলনামূলক ভালভাবে পালন করে। অন্যদিকে যেসব বাগান এখনও ব্যক্তি মালিকানাধীন সেসব বাগানে শ্রমিকরা সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় বলে গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। তবে পূর্বের তুলনায় শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে অবস্থার কিছুটা অগ্রগতি হলেও এখন চা শ্রমিকদের অবস্থা বাংলাদেশের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। এখনও তারা যে ধরনের নিম্ন মানের জীবযাপন করে তা অনেক ক্ষেত্রেই অন্য খাতের সাথে কিংবা বাংলাদেশের সাধারণ জীবন-যাত্রার সাথে তুলনার অযোগ্য। এখনও তারা দৈনিক মাত্র ১৬৯ টাকা (প্রাপ্ত সকল আর্থিক ও অ-আর্থিক সুবিধাদিসহ) মজুরি পায়। কর্তৃপক্ষের সাথে বার বার দর কষাকষি করেও এর পরিমাণ বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও তাদের আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা,পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রক্ষালন ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তাদের ঘর-বাড়ির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় কত জরাজীর্ণ পরিবেশে তারা মানুষ ও পশুপাখি মিলে একসাথে একটি মাত্র ঘরে বসবাস করছে। তারা মূলধারার জীবন থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপণ করছে। বেশিরভাগ ঘরবাড়িতে আসবাবপত্র বলতে বড়জোর একটি চৌকি খাট দেখা যায়। এর বাইরে নেই তেমন কোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি।

চা শ্রমিকদের এই বঞ্চনার অন্যতম কারণ হচ্ছে আইনগত সীমাবদ্ধতা। আইনে শ্রমিকদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ রয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট নয়। তাদের বঞ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধারায় এমনভাবে শিথিল করা হয়েছে যার ফলে কর্তৃপক্ষ এসব সুবিধা দিতে বাধ্যবাধকতা অনুভব করে না। আবার অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা যেসব সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য সেসব সুবিধা বাগান কর্তৃপক্ষ সকল শ্রমিককে সমানভাবে দিচ্ছে না। মূল বাগানের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই ফাড়ি বাগানের শ্রমিকরা বেশি বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কিছু কিছু শ্রমিকদের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে দিলেও বেশিরভাগ শ্রমিকদেরই বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলে বছরের পর বছর ধরে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে না। এছাড়া শ্রমিকদের বঞ্চিত করার জন্য বাগানগুলোকে জবাবদিহি কাঠামো খুবই দুর্বল। ফলে বাগান কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রমিকগণ তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নিম্নে চা বাগানের শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিরাজমান চ্যালেঞ্জের পিছনে কি কি কারণ রয়েছে, তার ফলাফল কি এবং তার প্রভাবের একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.১: চা বাগান শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জের কারণ, ফলাফল ও প্রভাবের সার্বিক চিত্র

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• আইনের ঘাটতি • তদারকি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি • বাগান কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব ও প্রভাব বিস্তার • শ্রমিকদের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব এবং তথ্য না জানা • চা বাগানের ভৌগোলিক অবস্থান ও মাটির ধরন • বাগানে দক্ষ চিকিৎসকের অনুপস্থিতি ও ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জাম না থাকা • মান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকা	• শ্রমিকদের সঠিক মজুরি থেকে বঞ্চিত করা • আবাসন, ছুটি, কল্যাণ তহবিলের অর্থ, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন সুবিধাসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হওয়া • তদারকি প্রতিষ্ঠানের সঠিকভাবে পরিদর্শন না করা ও সঠিকভাবে প্রতিবেদন জমা না দেওয়া • চাকরি স্থায়ী না করা • নিজেদের অধিকারের জন্য দাবি উত্থাপন	• সময় উপযোগী সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে বঞ্চনা • শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পরা • শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি • বছরের পর বছর ধরে আর্থ-সামাজিক অবস্থার

• সামাজিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দের অপ্রতুলতা • সরকারি বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা • পাতার ওজন করার জন্য ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার না করা • শ্রমিক সংগঠনের সক্ষমতায় ঘাটতি ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় দর কষাকষিতে ব্যর্থতা • বাগানের বাবু ও ম্যানেজারদের অনিয়ম-দুর্নীতি • চা বাগান শ্রমিকদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষাসহ বিভিন্ন রীতি-নীতি	করতে না পারা • দ্বিপক্ষীয় চুক্তি নবায়ন ও কার্যকরতায় দীর্ঘসূত্রতা • শ্রমিকদের এরিয়ারের টাকা প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রতা • সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া • শ্রমিক জীবন-মান উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দ কাজে লাগাতে ব্যর্থতা • চা বাগান ও শ্রমিকদের বড়িতে পৌঁছানোর যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঘাটতি	উন্নতি না হওয়া • মূলধারার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে চা বাগানের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলো বিদ্যমান রয়েছে তার মধ্যে আইনের সীমাবদ্ধতা, সরকারি তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি, তাদের দায়িত্বে অবহেলা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া, চা বাগানগুলোর ভৌগলিক অবস্থান, সরকারি বরাদ্দ ব্যয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব ও প্রভাব বিস্তার, শ্রমিক সংগঠনের সীমাবদ্ধতা, মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকা, শ্রমিকদের সংস্কৃতি, ভাষা ও রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলোই প্রধানত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এসব কারণে শ্রমিকরা তাদের ছুটি, আবাসন, চিকিৎসা, পানীয় জল, শিক্ষা, মজুরি, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রমিকরা তাদের অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম হয় না, তারা তাদের এরিয়ারের টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়, সঠিক পরিমাণে ভবিষ্য তহবিলের টাকা পায় না এবং যতটুকু পায় তার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। আর যেহেতু তারা বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হয়, ফলে বছরের পর বছর ধরে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় না, তারা মূলধারার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা শারীরিক সক্ষমতা হারাচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, গত এক দশকে চা শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষা, শৌচাগার ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতির কারণে সামগ্রিকভাবে তারা এখনও দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। তাদেরকে আইনগতভাবেই বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ফলে তাদের মজুরি, ছুটি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাসস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্যতাই তৈরি হয় না যা তারা দাবি করতে পারে। তাছাড়া আইনগতভাবে প্রাপ্য অধিকার থেকেও চা শ্রমিকরা রয়েছে বঞ্চিত। সকল সুবিধা দেওয়ার নামে তাদের দৈনিক যে মজুরি দেওয়া হয় তা দেশের অন্যান্য খাতের মজুরির তুলনা অনেক কম। ফলে শত বছর ধরে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে না। তাদের নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতির কারণে দিনের পর দিন বাধ্য হচ্ছে চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করার চক্রের মধ্যে। তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে তারা জনবল স্বল্পতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাবে চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে অধিকার আদায়ে দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দর কষাকষি করতে পারছে না। সর্বোপরি চা শ্রমিকদের আইনগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতসহ সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাগান কর্তৃপক্ষ আরো আন্তরিক হলে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি তদারকি কর্তৃপক্ষের কাজের মাধ্যমে বাগান মালিকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে চা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি চা শিল্প আরো লাভজনক অবস্থানে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। চা বাগানের শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে এসব চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

৬.২ সুপারিশ

১. সরকার ও বাগান মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের অনুমতি সাপেক্ষে একটি যৌক্তিক, ন্যায্য এবং অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে; প্রতি দুই বছর পর পর তা বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হালনাগাদ করতে হবে। যেসব শ্রমিক কারখানায় ও কীটনাশক ছিটানোসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকবে তাদের জন্য ন্যায়সংগত বাড়তি মজুরি ও ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া তাদের এসব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পোশাক, গ্লাভস ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. আইন, বিধিমালা ও সমঝোতা স্মারকের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে -

- ❖ অস্থায়ী শ্রমিকদেরও স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় সমান মজুরি প্রদান
- ❖ সকল শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গের জন্য বিধিমালায় নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা; বাগানের বাইরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচ ও তা শ্রমিককে প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা শ্রমিকের চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রকার খরচ করা;
- ❖ প্রতিটি চা বাগানে শিশুদের জন্য শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা সংবলিত শিশুসদন নিশ্চিত করা, যাতে চা শ্রমিকদের শিশুরা নিরাপদে থাকতে পারে এবং চা শ্রমিকরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে;
- ❖ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সকল স্থায়ী শ্রমিকের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা, দীর্ঘ দিনের পুরাণ ও জরাজীর্ণ ঘর অপসারণ করে দ্রুত নতুন ঘর নির্মাণ করা; প্রদেয় ঘরের ধরন (পাকা দেয়াল ও টিনের চাল) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিধিমালায় উল্লেখ ও তা কার্যকর করা;
- ❖ সমঝোতা চুক্তি অনুসারে মালিক কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যায় নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি পরিবারের জন্য নিজস্ব মিটারের ব্যবস্থা করা ও দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় শ্রমিকের নামে আলাদা বিল প্রেরণ;
- ❖ প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার;
- ❖ শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান;
- ❖ মর্নিং ও ক্যাশ প্লাকিং তথা অতিরিক্ত পাতা তোলা বা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান;
- ❖ প্রতিটি সেকশন, আবাসন ও কাজের জায়গায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ❖ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেক স্থায়ী শ্রমিককে নিয়োগপত্র দেওয়া এবং নিয়ম অনুসারে সার্ভিস বুক সংরক্ষণ করা;
- ❖ শ্রম আইন অনুযায়ী অস্থায়ী শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় পর স্থায়ী করা; দীর্ঘকাল অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরও একই কাজে আরও এক বছর শিক্ষানবীশকাল রাখা বন্ধ করা;
- ❖ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী নম্বরগুলোতে জোঁক ও পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❖ গর্ভধারণ মাসের পূর্বের তিন মাসের গড় মজুরি হিসাব করে মাতৃত্বকালীন মজুরি প্রদান;
- ❖ গ্রুপ বীমা চালুকরণ;
- ❖ চা শ্রমিকদের জন্য দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে।

৩. সমঝোতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের আলোচনা শেষ করতে হবে এবং চুক্তি নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, যাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর করা যায়

৪. উত্তোলনকৃত পাতার ওজন কম দেখানো বন্ধ করতে প্রতিটি বাগানের প্রতিটি সংগ্রহ কেন্দ্রে উভয়মুখী ডিসপ্লে সমৃদ্ধ ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শ্রমিকরাও পাতা মাপার সময়ে পরিমাণ দেখতে পারে। তাছাড়া চা পাতা ওজন এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করতে হবে। পাশাপাশি সকল বাগানের জন্য গামছা, পরিবহণ ও বৃষ্টিজনিত কারণে পাতা কেটে রাখা বন্ধ করতে হবে

৫. ভবিষ্য তহবিল অফিসের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করতে হবে এবং প্রতিমাসে শ্রমিকের টাকা জমার বিষয়ে মুঠোফোন বা এ জাতীয় সহজলভ্য কোনো মাধ্যমে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে নিয়ম অনুসারে অবসর গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ভবিষ্য তহবিলের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৬. বাগানগুলোতে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যকর পরিদর্শন বাড়াতে হবে। পরিদর্শনের প্রতিবেদনের অনুলিপি বাগান কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নকেও প্রেরণ করতে হবে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত আইনের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৭. বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সার্বজনীন শিক্ষার সরকারি নীতি অনুযায়ী সকল চা শ্রমিকের সন্তানের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যে স্থাপিত হাসপাতালের অবকাঠামোর

পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতসহ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে। বাগান পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে।

৮. জমি লীজ দেওয়ার একটি নিয়ম বা আইন তৈরি করতে হবে। শ্রমিকদের রেশনের পরিবর্তে জমি দেওয়া বা জমি বরাদ্দের বিপরীতে রেশন কেটে রাখার নিয়মটি বন্ধ করতে হবে।

৯. শ্রমিকদের সহজ অভিগম্যতার জন্য সিলেট অঞ্চলের চা বাগান সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে একটি শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে;

১০. চা শ্রমিকদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং আইন সম্পর্কে সচেতন করতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত সদস্য ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. চিকিৎসাকেন্দ্রে বিদ্যমান সকল ওষুধের একটি হালনাগাদ তালিকা, চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সময়সূচি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

১২. প্রতিটি চা বাগানে ডিডিএল কার্যালয় কর্তৃক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে একজন অভিযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্ধারণ এবং তার নাম দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন, একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন এবং অভিযোগ নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. প্রতিটি বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে পৃথক প্রসবকক্ষ রাখতে হবে, এবং শ্রমিকদেরকে চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসব করানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১৪. প্রতিটি বাগানের শ্রমিকদের শ্রমিক ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার, শ্রমিক ইউনিয়ন ও বিটিএ কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠানে সরকারকে যথাসময়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

১৫. মৃত শ্রমিকের সৎকারের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের একটি বরাদ্দ থাকতে হবে এবং তা সমঝোতা চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

১৬. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন নামক প্রকল্পের মত আরো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব প্রকল্পে খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রী বিতরণের পরিবর্তে নগদ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। চলমান প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। এছাড়া শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. বাংলাদেশীয় চা সংসদসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে 'চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা'টির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

১৮. মালিক কর্তৃক শ্রমিক কলোনিতে যাতায়াতের রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করতে হবে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে তাদের আবাসস্থল সহজ যোগাযোগ উপযোগী স্থানে নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ করতে হবে।

১৯. বাগানগুলোতে মদের দোকান বন্ধ করতে হবে এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভিযান চালাতে হবে।

২০. বাল্য বিবাহ রোধ করতে বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এ বিষয়ে চা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২১. বাগান কর্তৃপক্ষের অবমাননাকর আচরণ যেমন জুতা খোলানো ও পড়ানো, পঞ্চায়েতদের চেয়ারে বসতে না দেওয়া ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

২২. প্রতিটি বাগানে পুরুষ সর্দার নিয়োগের পাশাপাশি নারী সর্দার নিয়োগ করতে হবে।

-০-

তথ্যসূত্র

১. গাইন ফিলিপ, চা শ্রমিকের কথা, বাংলাদেশের চা ও চা-শ্রমিক, ২০০৯
২. উল্লাহ মো. রহমত, Story of the Tea Workers Subsistence against Hegemony, নভেম্বর ২০১৪
৩. খাঁ মাহমুদা, নারী চা শ্রমিকদের জীবন চিত্র, বাংলা ইনসাইডার, ১৫ জুলাই ২০১৭
৪. আহমেদ সেলিম, ছেটে দেওয়া গাছের মতো চা শ্রমিকদের জীবন, মানব কণ্ঠ, ২০ মে ২০১৭
৫. সুদীপ্ত আরিকুজ্জামান, On Human Bondage, Slave in this times: Tea Communities of Bangladesh, ২০১৬
৬. বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সোসাইটি ফর এনভারনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, মার্চ ২০১৪
৭. চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামজিক এজেন্ডা, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
৮. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১১ অক্টবর, ২০০৬
৯. বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত ২০১৩), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
১০. বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৫
১১. জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৮ মে ২০১২
১২. স্ট্যাটিস্টিকস অন বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রি, প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, বাংলাদেশ টি বোর্ড, ২০১৫
১৩. ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ চা বোর্ড, http://www.teaboard.gov.bd/
১৪. বাংলাদেশীয় চা সংসদের ব্রশিউর
১৫. 'দিন বদলের সনদ', নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০০৮
১৬. এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪
১৭. বাগানের স্কুলে চা-শ্রমিকের সন্তানদের ২৫ ভাগ কোটার পরামর্শ অর্থমন্ত্রীর, প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি, ২০১৭
১৮. কমলগঞ্জে চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোস, প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪,
১৯. ফটিকছড়ির চা-বাগানের ৭৪ জন নিখোঁজ, প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০১৭
২০. ধামাই চা বাগান মজুরি-রেশনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, প্রথম আলো, ১৮ জুলাই ২০১৬
২১. ১০ দফা দাবিতে শ্রমিকদের একাংশের ধর্মঘট চলছে, প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৪
২২. ১২ দফা দাবিতে তিলকপুর চা-বাগানে ধর্মঘট, প্রথম আলো, ২৮ মে ২০১৩
২৩. শ্রীমঙ্গলে লাখাইছড়া চা-বাগানে শ্রমিকদের মানববন্ধন, প্রথম আলো, ০১ আগস্ট ২০১৩
২৪. দুই চা শ্রমিক কারাগারে, আবার উত্তপ্ত হচ্ছে কালাগুল চা-বাগান, প্রথম আলো, ০২ জুলাই ২০১৬
২৫. মৌলভীবাজারের তিনটি চা-বাগানে শ্রমিক ধর্মঘট, প্রথম আলো, ০৫ মার্চ ২০১৫
২৬. চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি ৪০০ টাকা করার দাবি, প্রথম আলো, ২৪ আগস্ট ২০১৫
২৭. সামান্য মজুরির চা শ্রমিকদের দুর্দশায় ভরা জীবন, সঠিক সংবাদ, ১৫ জানুয়ারি ২০১৬
২৮. চায়ের কাপের আড়ালের গল্প, hths://opinion.bdnews24.com/bangla, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭
২৯. ভূসম্পত্তি না থাকায় চাকরি বঞ্চিত হচ্ছে চা শ্রমিক পরিবারের দুই যুবক, সঠিক সংবাদ, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৩০. ওদের জীবন এমন কেন? বিডি টুডে, ২৬ অগস্ট ২০১৬
৩১. মৌলভীবাজার টুয়েন্টিফোর ডেস্ক, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৭
৩২. Tea garden workers: Living like slaves for 175 years, The Daily Star, ০৯ মার্চ ২০১৭
৩৩. Memorandum of Labour Agreement
৩৪. Tea Garden Labours and Their Living Conditions: A study on Sarusarai Tea Garden of Jorhat District of Assam,

http://www.internationalseminar.org/XV_AIS/TS%205B/8.%20Mrs.%20Sangeeta%20Saikia.pdf
৩৫. Pal Biswajit and Goswami Arunasis; Astudy on the Socio-Economic Condition of Tea Garden labours in Jalpaiguru district of West Bangal, India, http://www.garph.co.uk/IJARMSS/Aug2014/7.pdf
৩৬. http://www.academia.edu/10584787/Life_in_the_Labour_Lines_Situation_of_Tea_Workers_in_Bangladesh
৩৭. Paul-Majumder Pratima, Working Conditions in The Bangladesh Tea Plantation Industry Source of data - http://pdf.steerweb.org/WFP%20ESSAY/tea.pdf, 08.01.2018
৩৮. http://www.compensation.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=724&lang=en
৩৯. http://mwb.portal.gov.bd/site/page/a79b5bb8-d9d1-49fe-9aa6-f4dfdee8f61e/সেক্টর-ভিত্তিক-নিম্নতম-মজুরি-

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: উত্তরবঙ্গের চা বাগান সম্পর্কিত তথ্য

পঞ্চগড় জেলার চা বাগান বিষয়ক তথ্য				
বাগানের ধরন	নিবন্ধিত	নিবন্ধনের অপেক্ষায়	বরাদ্দকৃত জমি (হেক্টর)	চা আবাদকৃত জমি (হেক্টর)
চা বাগান	০৮	০৮	১৪০৪.৬৬	৬৭৮.৪২
স্মল হোল্ডার	১৫	০১	৭২.০০	৪০.০৩
স্মল গ্রোয়ার	২৩৮	০৫	৩২২.২৮	৯৯.৮৫
মোট	২৬১	১৪	১৭৯৮.৯৪	৮১৮.৩০

পঞ্চগড় এলাকার শ্রমিকরা নিম্নলিখিতভাবে প্রথাগত চা বাগানের শ্রমিকদের থেকে আলাদা -

- সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জমিতে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হয়
- প্রথাগত শ্রমিকদের তুলনায় মজুরি অনেক বেশি দেওয়া হয় এবং হাজিরা ২৫ কেজির কম হলেও একদিনের মজুরি দেওয়া হয় যা প্রথাগত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কম হলে প্রতি কেজি ৩.২০ টাকা হিসেবে কেটে রাখা হয়
- কোনো রেশন দেওয়া হয় না
- যারা পাতা উত্তোলন করে তারা কেউ স্থায়ী শ্রমিক নয়। তারা কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড ,গ্র্যাচুইটি ও গ্রুপ ইন্সুরেন্স পায় না। নার্সারী ও বাগানের সর্দার, নিরাপত্তাকর্মী, বাগানের সহকারী ও সুপারভাইজাররা কেবল স্থায়ী (কাজী এন্ড কাজী কোম্পানিতে মাত্র ৩৯ জন) হিসেবে কাজ করে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ,গ্র্যাচুইটি ও গ্রুপ ইন্সুরেন্স পায়
- স্থায়ী শ্রমিকরা বেসিকের ৫০% বোনাস পায় এবং তারা কত দিন কাজ করল তা বিবেচনা না করে ৪০% বোনাস পায়। কিন্তু অস্থায়ী শ্রমিকরা শুধু ১৮০ দিন কাজ করলে বেসিকের ৪০% বোনাস পায়। কিন্তু এর কম দিন কাজ করলে বেসিকের ২০% বোনাস পায় কিন্তু
- শুধু বাসস্থান সুবিধা পায় স্থায়ী শ্রমিকরা। অন্যদের দেওয়া হয় না।
- অস্থায়ীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় না
- সার্ভিস বুক অস্থায়ীদের নাই
- জমি বরাদ্দ নাই। পুরোপুরি ব্যক্তিগত জমি। সরকারের নিকট থেকে লিজ নিতে হয় না
- যেহেতু এই এলাকায় সকল বাগান ব্যক্তিগত সেহেতু জমি বরাদ্দের স্থায়ী বাধ্যবাধকতা নাই।
- অন্যান্য সুবিধা যেমন বাসস্থান ও বাসস্থান মেরামত, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন ব্যবস্থা, শিশু সদন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বাসস্থানে আলোর ব্যবস্থা, প্রক্ষালণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা অস্থায়ী শ্রমিকদের দেওয়া হয় না।

পরিশিষ্ট ২: উত্তরদাতাদের বয়স

বয়স শ্রেণি	শতকরা
<১৮	০.৫
১৮-২৭	১৪.৯
২৮-৩৭	৩০.৬
৩৮-৪৭	২৬.০
৪৮-৫৭	১৯.৬
৫৮+	৮.৫

পরিশিষ্ট ৩: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	নারী (%)	পুরুষ (%)	সার্বিক (%)
নিরক্ষর	৫০.০	২১.৫	৩৬.৬
স্বাক্ষরজ্ঞান	৩৮.২	৩৭.৭	৩৭.৯
প্রাথমিক	১০.৬	৩৪.৪	২১.৮
এসএসসি	১.০	৫.৩	৩.০
এইচএসসি	০.২	১.২	০.৭

পরিশিষ্ট ৪: খানা সদস্যদের বয়স

বয়স সীমা (বছর)	শতকরা
০-৯	১৯.১
১০-১৯	২৩.৯
২০-২৯	১৬.৯
৩০-৩৯	১৩.৭
৪০-৪৯	১০.৯
৫০-৫৯	৮.১
৬০+	৭.৪

পরিশিষ্ট ৫: খানার মাসিক ব্যয়

মাসিক ব্যয়ের সীমা (টাকা)	শতকরা
০-২০০০	২.৭
২০০১-৪০০০	২৩.৪
৪০০১-৬০০০	৩৪.৮
৬০০১-৮০০০	১৯.৩
৮০০১-১০০০০	৯.৭
১০০০১-১২০০০	৪.৩
১২০০০+	৫.৯

পরিশিষ্ট ৬: স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পেতে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ধরন

সমস্যার ধরন	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
সময় বেশি লেগেছে	৯২.৫	৯৮.৩	৯৪.৪
মানুষের সহায়তা নিতে হয়েছে	৩.৮	০.০	২.৫
সময় বেশি লেগেছে ও মানুষের সহায়তা নিতে হয়েছে	৩.১	০.০	২.০
ঘুষ দিতে হয়েছে	০.৪	১.০	০.৬
সময় বেশি লেগেছে ও ঘুষ দিতে হয়েছে	০.৪	০.৭	০.৫

পরিশিষ্ট ৭: খানার অন্যান্য শ্রমিকদের অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার সময়কাল

সময়ক্ষেপনের সীমা (বছরে)	মূল বাগান	ফাড়ি বাগান	সার্বিক
<২	১৮.৫%	১৫.৬%	১৭.৪%
২-৪	২৪.৯%	২৯.৬%	২৬.৬%
৪-৬	১৬.৩%	১১.১%	১৪.৪%
৬-৮	১০.৩%	৬.৭%	৯.০%
৮-১০	৮.২%	৫.২%	৭.১%
১০-১২	৬.৪%	৫.২%	৬.০%
১২-১৪	৫.২%	৫.২%	৫.২%
১৪-১৬	২.১%	৬.৭%	৩.৮%
১৬-১৮	০.৯%	৩.০%	১.৬%
১৮-২০	২.১%	৬.৭%	৩.৮%
>২০	৫.২%	৫.২%	৫.২%

পরিশিষ্ট ৮: বিভিন্ন খাতে কেটে রাখার পাতার আর্থিক মূল্য

মোট স্থায়ী শ্রমিক ১০০৮৪৩ জন

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক ৯৫৯ জন (১৯১১ জনের মধ্যে) অর্থাৎ ৫০.২%। এই ৯৫৯ জনের মধ্যে ৫৭৯ জন, অর্থাৎ ৬০.৩% পাতার ওজনের সঠিকতা বিষয়ে তথ্য দিতে পেরেছে। বাকি ৩৮০ জনের মধ্যে ২১ জন বলেছেন তারা জানেন না সঠিক ছিল কিনা, আর ৩৬০ জন উত্তরদাতা ছিল অফসিজনের।

যে ৫৭৯ জন পাতার ওজনের সঠিকতা বিষয়ে তথ্য দিতে পেরেছে তাদের মধ্যে ৩৫৫ জন অর্থাৎ ৬১.৩% বিভিন্ন খাতে পাতা কেটে রাখার তথ্য দিয়েছে। যা নিম্নরূপ:

পাতা কেটে রাখার খাতসমূহ	**কেটে রাখে**	
	সংখ্যা	**শতকরা**
গামছার (ওজনের) জন্য	৩২৯	৯২.৬
পরিবহনের সময় পাতা পড়ে (অজুহাতে)	২৯	৮.২
বৃষ্টি হলে	২৫৮	৭২.৬
কোন কারণ ছাড়াই	৬৪	১৮.০

মোট স্থায়ী শ্রমিক ১০০৮৪৩ জনকে জরিপের তথ্যের সাথে তুলনায় নিলে;

পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক ৫০৬২৩.১৯ জন

পাতার ওজনের সঠিকতা বিষয়ে তথ্য দিতে পারবে ৬০.৩% অর্থাৎ ৩০৫৭৬.৪০ জন

৩০৫৭৬.৪০ জনের মধ্যে বিভিন্ন খাতে পাতা কেটে রাখার তথ্য দেবে ৬১.৩% বা ১৮৭৪৩.৩৪ জন। অর্থাৎ

কারণসমূহ	শ্রমিক প্রতি দৈনিক গড়ে	ওজনে কম দিয়েছে বলেছে (%)	শ্রমিক সংখ্যা-জন	প্রতি ক্ষেত্রে দৈনিক মোট কর্তন (কেজি)	টাকার অংকে কর্তন (২৩ কেজিতে হাজিরা এবং দৈনিক ১০২ টাকা মজুরি হিসাবে)
গামছার ওজনের জন্য	২.৯ কেজি	৯২.৬	১৭৩৬১.২৫	৫০৩৪৭.৬২২	২২৩২৮০.৮
পরিবহনের সময় পাতা পড়ে যাওয়া	২.৪ কেজি	৮.২	১৫৩০.৩২	৩৬৭২.৭৭৫	১৬২৮৮.০
বৃষ্টি হলে	৪.১ কেজি	৭২.৬	১৩৬১৪.৬০	৫৫৮১৯.৮৪৬	২৪৭৫৪৮.৯
কোনো কারণ ছাড়া	২.০ কেজি	১৮.০	৩৩৭৭.২৬	৬৭৫৪.৫২৯	২৯৯৫৪.৯
মোট			**৩৫৮৮৩.৪৩**	**১১৬৫৯৪.৭৭১৬**	**৫১৭০৭২.৫**

টাকার অংকে কর্তন

দৈনিক কর্তন- ৫১৭০৭২.৫ টাকা

সপ্তাহে ৬ দিন কাজ হিসেবে সপ্তাহে কর্তন- ৩১০২৪৩৪.৮ টাকা

পরিশিষ্ট ৯: কুয়া ও ছড়ার পানি সরবরাহের চিত্র ও ভবিষ্য তহবিলের বাৎসরিক বিবরণীর চিত্র

কুয়ার পানি সরবরাহের চিত্র

ভবিষ্য তহবিলের বাৎসরিক বিবরণী

বাংলাদেশ চা বাগান শ্রমিক ভবিষ্য তহবিল

ছড়ার পানি সরবরাহের চিত্র

পরিশিষ্ট ১০: অভিযোগের বিষয়

অভিযোগের বিষয়	মূল বাগান (f)	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (f)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (f)	সার্বিক (%)
প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া	২৮	১২.৬	৯	৬.৩	৩৭	১০.১
পারিবারিক	২০	৯.০	৪	২.৮	২৪	৬.৫
ছেলেকে কাজ দেওয়ার জন্য	৫	২.২	২	১.৪	৭	১.৯
ঘর মেরামত এর জন্য	৭৭	৩৪.৫	৭৯	৫৪.৯	১৫৬	৪২.৫
হাজিরার টাকা বাড়ানোর জন্য	৫	২.২	১	০.৭	৬	১.৬
ফান্ডের কাগজের জন্য	২	০.৯	২	১.৪	৪	১.১
মেডিকেল এর ঔষধ নিয়ে	৯	৪.০	১	০.৭	১০	২.৭

রেশনের ব্যাপারে	৫	২.২	২	১.৪	৭	১.৯
ল্যাট্রিন এর বিষয় নিয়ে	৫	২.২	৩	২.১	৮	২.২
স্থায়ী করার জন্যে	১২	৫.৪	৩	২.১	১৫	৪.১
জমি সংক্রান্ত	৭	৩.১	৬	৪.২	১৩	৩.৫
বেতন কম দিয়েছে	৭	৩.১	৪	২.৮	১১	৩.০
স্বামীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য/নিজের/স্ত্রীর	৬	২.৭	৫	৩.৫	১১	৩.০
বিদ্যুৎ এর জন্য	০	০.০	২	১.৪	২	০.৫
পানির সমস্যা	৪	১.৮	১	০.৭	৫	১.৪
হাসপাতালের জন্য	৩	১.৩	২	১.৪	৫	১.৪
গরু-ছাগল পালনের জন্য	৩	১.৩	০	০.০	৩	০.৮
ফান্ডে নাম উঠানোর জন্য	৪	১.৮	০	০.০	৪	১.১
বোনাস এর টাকা কম পাওয়ার কারণে	১	০.৪	০	০.০	১	০.৩
কীটনাশক ছিটানোর সময় প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়ার জন্য	৫	২.২	৩	২.১	৮	২.২
অসুস্থ থাকলেও ছুটি দেওয়া হয়নি	৪	১.৮	২	১.৪	৬	১.৬
কাজ বদল করে দেওয়ার জন্য	২	০.৯	৪	২.৮	৬	১.৬
ফান্ডের টাকা পাওয়ার জন্য	৩	১.৩	১	০.৭	৪	১.১
অন্যান্য	৬	২.৭	৮	৫.৬	১০	২.৭
মোট	২২৩	১০০.০	১৪৪	১০০.০	৩৬৭	১০০.০

পরিশিষ্ট ১১: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন

কর্মসূচির ধরন	মূল বাগান (%)	ফাড়ি বাগান (%)	সার্বিক (%)
বয়স্ক ভাতা	৭২.৭	৭৫.৫	৭৩.৯
বিধবা ভাতা	১৪.১	৯.২	১১.৯
ভিজিডি	৮.৬	৩.১	৬.২
প্রতিবন্ধী ভাতা	৩.১	৮.২	৫.৩
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা	০	২	০.৯
ভিজিএফ	১.৬	২	১.৮